আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মুখপত্র

মাসিক সুন্নীবার্তা

১৯৩

SUNNI BARTA

১৯৩ তম সংখ্যা জুন'১৭ শাওয়াল ১৪৩৮ হিজরী

BJS
BANGLADESH
JUBOSENA

www.sunnibarta.com

ঘুটিয়া মসজিদ, বরিশাল, বাংলাদেশ।

প্রচারেঃ গাউসুল আযম রেলওয়ে জামে মসজিদ

E-mail : sunnibarta@gmail.com. Website : www.sunnibarta.com

নং- জেপ্রঢা/প্রকা:/২০০৭/০৭

মাসিক
সুন্নীবার্তা
SUNNI BARTA

হাদিয়া টা: ১৫.০০

প্রতিষ্ঠাতা
অধ্যক্ষ হাফেয মুহাম্মদ আব্দুল জলিল (রাঃ)
এম.এম.এম.এ-বিসিএস

সম্পাদক
মুফতী মোহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন
খতীব, গাউছুল আ'যম রেলওয়ে জামে মসজিদ, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা।

সহকারী সম্পাদক
আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবুল হাশেম
প্রেসিডিয়াম সদস্য, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশ।

ডঃ এ্যাডভোকেট আব্দুল আউয়াল
প্রেসিডিয়াম সদস্য, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশ।

নির্বাহী পরিচালক
আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুর রব
প্রেসিডিয়াম সদস্য, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশ।
যুগ্ম পরিচালক (অবঃ), বাংলাদেশ ব্যাংক
ফোন ঃ ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-০৯০৬৯৯৬

যোগাযোগের ঠিকানা
আলহাজ্ব মোঃ আবদুর রব, মোবাইল: ০১৭২০৯০৬৯৯৬
আলহাজ্ব মোঃ শাহ আলম, মোবাইল : ০১৬৭০৮২৭৫৬৮
গাউছুল আ'যম রেলওয়ে জামে মসজিদ, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা-১২১৭

অফিস নির্বাহী
মুহাম্মদ সেকান্দর হোসেন সুমন
সভাপতি, বাংলাদেশ যুবসেনা, মোবাইল ঃ ০১৭১৬৫৭৩৩৩৩
সহযোগী ঃ মোঃ আবু তাহের, মোঃ ইয়াছিন আলী,
মোঃ আবু সাইদ, মোঃ রফিকুল ইসলাম

মহিলা অঙ্গন
সৈয়দা হাবিবুন্নেছা দুলন

উপদেষ্টা পরিষদ

- অধ্যাপক আলহাজ্ব এম. এ. হাই
- ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ কুদরত উল্লাহ
- আলহাজ্ব মোহাম্মদ শাহ আলম
- আলহাজ্ব এ্যাডঃ দেলোয়ার হোসেন পাটোয়ারী আশরাফী
- কাজী মাওঃ মোবারক হোসাইন ফরাজী আল-কাদেরী
- মুহাম্মদ সাইফুদ্দিন
- আলহাজ্ব মোঃ মজিবুর রহমান
- মোহাম্মদ হামিদুল হক শামীম (কাউন্সিলর)
- ফারুক আহমেদ আশরাফী
- এডভোকেট কামরুল হাসান খায়ের
- মুহাম্মদ ইউসুফ মিয়া
- মুহাম্মদ মজিবুর রহমান খান মুকুল
- নুরে সালাম

সহযোগিতায়

- এ্যাডভোকেট মোঃ জালাল উদ্দিন
- আলহাজ্ব আজিজুল হক চৌধুরী
- আলহাজ্ব মোঃ জাকির হোসেন
- এ.কে.এম. হাবিব উল কুদ্দুস
- আলহাজ্ব আবু আক্তার ফকির
- মোঃ শহীদুর রহমান
- সুলতান আহম্মেদ
- মোঃ মফিজুর রহমান
- ইঞ্জিনিয়ার শাহ্ আলম বাদল
- মোঃ খলিলুল্লাহ্ পাটোয়ারী
- আলহাজ্ব মোঃ শহিদুল্লাহ্
- কাজী নুরুল আফসার বিদ্যুৎ
- আলহাজ্ব রশিদ আহম্মদ কাজল
- মোঃ শরীফ
- হাজী আলী হোসাইন জাহাঙ্গীর
- সৈয়দ মোঃ নাঈম
- মুহাম্মদ আব্দুল আলীম
- মোঃ সিরাজুল ইসলাম

চারে ঃ গাউসুল আযম রেলওয়ে জামে মসজিদ, শাহ্জাহানপুর, ঢাকা
স্বত্বে ঃ সুন্নী ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স

বিজ্ঞাপনের হার ঃ রঙ্গীন পূর্ণ পৃষ্ঠা-৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা-২৫০০ (দুই হাজার পাঁচশত টাকা), কোয়াটার পৃষ্ঠা-১০০০ টাকা

wvt w`jæev Bqvmwgb কর্তৃক প্রকাশিত এবং আল্ কারনী প্রিন্টার্স, ১০০/এ, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০ হতে মুদ্রিত
ফোন ঃ ৯১১১৬০৭, E-mail : sunnibarta@gmail.com. Website: www.sunnibarta.com

সূচীপত্র

দরসে হাদীস---------- - ০৩

মাহে শাওয়াল---------- - ০৬

ঈদুল ফিতর ও মাহে শাওয়ালের তাৎপর্য--- - ০৮

ঈদ হোক মুসলিম উম্মাহ্ 'র জাগরণের প্রতীক---------- - ১৩

কোরআনই বিজ্ঞানের প্রধান উৎস--------- - ১৫

সাদক্বাতুল ফিত্‌র, ঈদুল ফিতর এবং পরবর্তী নফল ইবাদত---------- - ১৮

ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর ৬টি; ১২ টি নয়---------- - ২০

সদকায়ে জারিয়ার ফযিলত---------- - ২২

প্রশ্নোত্তর (আক্বিদা ও আমল)---------- - ২৫

বিদ'আত : একটি পর্যালোচনা---------- - ২৯

- যে আমার রওযা যিয়ারত করবে তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব।
- যে ব্যক্তি আমার রওযা শরীফ যিয়ারত করবে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য শাফায়াতকারী ও সাক্ষী হবো।
- যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার রওযা শরীফ জিয়ারত করবে, কিয়ামতের দিন সে আমার প্রতিবেশী হবে।
- যে ব্যক্তি অন্য কোন উদ্দেশ্য ছাড়া একমাত্র আমার রওযা শরীফ যিয়ারত

সম্পাদকীয়

৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪ ❖ ১৮ রমজান ১৪৩৮ ❖ ১৪ জুন ২০১৭

ঈদ মোবারক - ঈদ মোবারক

ঈদের অগ্রীম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সুন্নীবার্তার লেখক, পাঠক, গ্রাহক, এজেন্সী, সহযোগী, উপদেষ্টা পরিষদ এবং শুভাকাঙ্খিদেরকে। ঈদ মুসলিম সমাজের অন্যতম বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব। এই দিনে লক্ষ-লক্ষ পাপী মুসলমানকে আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দেন। কিন্তু দু:খের বিষয় হল- আমাদের সমাজে ঈদ মানে কিছু মানুষ বুঝে নতুন কাপড় পড়ে ঘুরাঘুরি করার নাম। আমাদের জানতে হবে কেবল নতুন জামা কাপড় পড়ে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হওয়া কিংবা বেপর্দাভাবে ঘুরাফেরা করার নাম ঈদ নয়; বরং ইবাদতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে ঘোষিত মহান পুরস্কার লাভের নাম ঈদ।

আমরা যদি গবেষণা করে দেখি, এই ঈদের দিনে অর্ধ পৃথিবীর শাসক হযরত ওমর (রা.) ঘরের দরজা বন্ধ করে আঝোর নয়নে কেঁদে ছিলেন কেন। তাঁর ভাষায়- ঈদের দিন মহান আল্লাহ্ অনেক বান্দাকে কবুল করে নিবেন আবার অনেক বান্দাকে প্রত্যাখান করবেন। আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে, আমরা কোন দলে রয়েছি।

সুতরাং, আসুন আমরা আল্লাহ্ তায়ালা ও তাঁর প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এই দিনটি ইবাদত বান্দেগীর মাধ্যমে উৎযাপন করি। পরিশেষে কামনা করছি ঈদ বয়ে আনুক সকলের জীবনে আনন্দ এবং কল্যাণ।

দরসে হাদীস

মাওলানা মুহাম্মাদ বখতিয়ার উদ্দীন

عَنْ عَمْرَو بْنَ أَخْطَبَ، قَالَ: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ، وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرُ، فَنَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ» فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا-

অনুবাদঃ হযরত আমর ইবনে আখতাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায পড়লেন। অতঃপর মিম্বরে আরোহন করে আমাদের উদ্দ্যেশে দীর্ঘ বক্তব্য প্রদান করলেন; এমনকি যোহরের নামাযের সময় হয়ে গেল। এক পর্যায়ে তিনি মিম্বর হতে নেমে এসে যোহরের নামায পড়ালেন। অতঃপর আবারো আরোহন করলেন মিম্বরে, আর বক্তব্য দেয়া শুরু করলেন, এমনকি আসরের নামাযের সময় উপস্থিত হল। অতঃপর মিম্বর হতে নেমে আসরও পড়লেন, পুণরায় মিম্বরে আরোহন করে বক্তব্য দিতে দিতে সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল। সেদিন নবীজি আমাদের সামনে অতীতে যা কিছু ছিল এবং ভবিষ্যতে যা কিছু হবে সকল বিষয়ে আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন। আমাদের মধ্যে যাঁদের স্মরণশক্তি অধিক তারা সে সব (অদৃশ্য) সংবাদ বেশি মনে রাখতে পেরেছেন।

(সূত্র ঃ বুখারী শরীফ হাদীস নম্বর ৬২৩০ কিতাবুল কদর, মুসলিম শরীফ হাদীস নম্বর ২৮৯১ কিতাবুল ফিতান, তিরমিযী শরীফ হাদীস নম্বর ২১৯১ কিতাবুল ফিতান, আবু দাউদ শরীফ হাদীস নম্বর ৪২৪ কিতাবুল ফিতান, মিশকাতুল মাসাবীহ কিতাবুল ফিতান ৪৩১ পৃষ্ঠা)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মহান রাব্বুল আলামীন পৃথিবীর বুকে মানবজাতির হিদায়াতের জন্য যত নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন সবাইকে তাদের নুবূয়াতের দলিল হিসেবে কতিপয় মু'জিযা দান করেছেন।

অন্য নবীদের ক্ষেত্রে সে সব মু'জিযার সংখ্যা সীমিত থাকলেও আমাদের প্রিয় রসূল সায়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র ব্যাপারটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। অন্য নবীদের যাবতীয় মু'জিযা একত্রিত করলে যা হয়, তার সবক'টি তো বটে, বরং এরপরেও আরো কত মু'জিযা দান করেছেন তা অংকিত করা যাবে এমন হিসেবের খাতা নীল আকাশের নিচে খুঁজে পাওয়া যাবে না। গণনার বাইরে যে সব মু'জিযা রয়েছে এর একটি হল ইলমে গায়ব বা অদৃশ্য জ্ঞান। এই ইলমে গায়ব মহানবীর অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যের অন্যতম আর মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। যেমন- কোরআনে পাকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন-

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً-

অর্থাৎ- "আপনি যা জানতেন তিনি আপনাকে সবই শিক্ষা দিয়েছেন এবং তা ছিল আপনার উপর আল্লাহ্‌র মহা অনুগ্রহ।" (আয়াত নং- ১১৩)

পবিত্র কোরআনের ভাষায় বলা যায়- নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র জন্য মহান আল্লাহ্ অজানা কিছুই রাখেননি; হোক না তা অতীত কিংবা ভবিষ্যত, কেয়ামত পরবর্তী বেহেশত-দোযখের সংবাদ পর্যন্ত সেখানে লুকিয়ে থাকতে পারেনি। তাইতো তিনি উপস্থিত লোকদের মনের খবরও বলে দিতে পারতেন। মুনাফিকদের অন্তরে আবৃত অন্ধকার কুঠুরিতে লালিত কপটতা প্রকাশ করে মসজিদ থেকে তাদের অনেককে বের করে দিয়েছিলেন তাতো হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত। এমন অনেক সাহাবীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বংশতালিকা নিখুঁতভাবে বলে দেওয়া কি প্রমাণ করে না নবীজীর ইলমে গায়ব বিতর্কের

www.sunnibarta.com

ঊর্ধ্বে একটি স্বীকৃত বিষয়? আল্লাহ্‌র রসূলের বাল্যবন্ধু নয় কেবল, সারা জীবনের একান্ত সঙ্গী ইসলামের প্রথম খলীফা এবং নবীদের পর যিনি শ্রেষ্ঠ মানুষ তথা সিদ্দীক্ব-ই আকবর হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণের প্রাক্কালে নবীজীর কাছে তাঁর নবূয়তের পক্ষে দলীল কী আছে জানতে চাইলে নবীজী উত্তর দিতে গিয়ে ভ্রু কুঁচকে ফেলেছিলেন? না বরং দু'শ ভাগ দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে বলে দিয়েছিলেন কেন গত রাতে তুমি যে স্বপ্ন দেখেছ- আকাশের চন্দ্র-সূর্য তোমার কোলে এসে হাজির। আর সিরিয়া যাত্রাপথের সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারী তোমাকে যা কিছু বলেছে তাই তো আমার নবূয়াতের পক্ষে দলীল। এমন আশ্চর্য তথ্যপ্রদান শুনে সিদ্দিক্ব-ই আকবর একেবারে স্তম্ভিত! সমস্ত শরীর যেন শিউরে উঠল তাঁর! কী আশ্চার্য! যে কথা আমি আর সুদূর সিরিয়ার সেই বৃদ্ধ লোকটি ছাড়া আর কেউ জানার কথা নয়, তার সব ক'টি পরিস্কার করে বলে দিলেন! এই অদৃশ্য জ্ঞানের সংবাদদাতা (নবী) কস্মিণকালেও মিথ্যানবী হতে পারেন না। তিনিই মহান আল্লাহ্‌র সত্য নবী সন্দেহাতীত ভাবে তা প্রমাণিত।

তদ্রূপ হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র কথা শোনা যাক। বদরের যুদ্ধের বন্দীদেরকে মুক্তিপণ দিয়ে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ হলে অন্য বন্দীরা যথারীতি মুক্তিপণ আদায়ে ব্যস্ত। এদিকে ভাতিজার কাছে এসে আবেদন করলেন, বাবা! আমিতো গরীব মানুষ। মুক্তিপণ দেয়ার মত আমার কাছে কোন সম্পত্তি নেই। উত্তরে নবীজী বললেন, কেন চাচা! আপনি শুধু শুধু মিথ্যা বলছেন? যুদ্ধে আসার পূর্বে আপনি আমার চাচীর কাছে যে স্বর্ণালংকার লুকিয়ে রেখে এসেছেন, সেগুলো কোথায় গেল? আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সে গোপন সংবাদ তো দুনিয়ার বুকে অন্য কেউ জানার কথা নয়। কিন্তু তাঁর ভাতিজা কীভাবে সুস্পষ্টভাবে বলে দিলেন, তা রীতিমত বিস্ময়ের! না! এ ধরনের অদৃশ্য সংবাদদাতা (নবী) কোনদিন মিথ্যা ও ভন্ড হতে পারেন না। তাঁর কপালও চমকে উঠল। নবীজীর হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে বলে উঠলেন হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাকে ইসলামের কালেমা শরীফ পড়িয়ে মুসলমান বানিয়ে দিন; আমি এতদিন ছিলাম গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। এবার আলোতে আসতে চাই। নবীজী তাঁকে কলেমা পড়িয়ে মুসলমান বানালেন। এভাবে আবু বকর মূহূর্তে বেহেশতী হয়ে গেলেন। শুধু কি তাই? নবীর পরশে শ্রেষ্ঠ সোনার মানুষে রূপান্তরিত হলেন। এভাবে হাজারো দৃষ্টান্ত রয়েছে যা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়- মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় হাবীবকে ইলমে গায়েব দান করেছেন।

এখন আমরা আরো কয়েকটি সহীহ হাদীসের উদ্ধৃতি পেশ করব, যাতে সহীহ হাদীস ছাড়া অন্য কিছু মানি না বলে যারা গলার পানি শুকিয়ে ফেলে, তারাও বিষয়টি সহজে বুঝতে পেরে হিদায়াত লাভ করতে পারে।

عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَامَ فِينَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا، فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الخَلْقِ، حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ، وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ، حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ، وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ-

অর্থাৎ-হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- একদা হুজূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে দন্ডায়মান হলেন। অতঃপর সৃষ্টি জগতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তথা বেহেশতবাসীরা বেহেশতে এবং দোযখবাসীরা দোযখে প্রবেশ করা পর্যন্ত সবকিছু আমাদের সামনে বলে দিলেন। আমাদের মধ্যে যারা মুখস্থ রাখতে পারে তারা মুখস্থ রেখেছে ; আর যারা ভুলে যাবার তারা ভুলে গেছে। *(বুখারীঃ হা.নং ৩০২০ বাবু বাদয়িল খালক্ব।*

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: «قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا، مَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، إِلَّا حَدَّثَ بِهِ»، حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ (مُتَّفق عَلَيْهِ)

অর্থাৎ, হযরত হুযাইফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করলেন- সেদিন থেকে কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে তার কোন বিষয়ই তাঁর বক্তব্যে বাদ দেননি। শ্রোতাদের মধ্যে যে মুখস্থ রাখার সে মুখস্থ রেখেছে, আর যে ভুলে যাবার সে ভুলে গেছে। (সূত্রঃ বুখারী শরীফ

www.sunnibarta.com

হাদীস নং ৬২৩০ কিতাবুল কদর, মুসলিম শরীফ হাদীছ নং ২৮৯১ কিতাবুল ফিতন)

হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু হতে বর্ণিত অপর এক হাদীস শরীফে দেখা যায়, তিনি বলেন-একদা নবী পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে তাশরীফ আনলেন তখন সূর্য পশ্চিামাকাশের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল (অর্থাৎ যোহরের নামাযের সময় হয়ে গিয়েছিল), অতঃপর নবীজী যোহরের নামায পড়লেন আর সালাম ফিরানোর পর মিম্বরে আরোহন করে কেয়ামতের আলোচনা রাখলেন এবং কেয়ামতের পূর্বেকার কতিপয় বড় বড় ঘটনার বর্ণনা দিলেন আর উপস্থিত সাহাবীদেরকে সম্বোধন করে বললেন- কারো কোন বিষয়ে জানার আগ্রহ থাকলে সে যেন আমাকে প্রশ্ন করে। তিনি আরো বলেন -খোদার কসম! তোমরা আমার কাছে যা কিছু জানতে চাইবে আমি এই মজলিসেই সব প্রশ্নের উত্তর দিব।

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এ দৃঢ় মনোবল দেখে আনসারী সাহাবীরা আনন্দেই কান্নার রোল বয়ে দিল। আর নবীজী বারবার বলে যাচ্ছেন- তোমরা আমাকে প্রশ্ন কর, প্রশ্ন কর। অতঃপর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল- হে আল্লাহ্‌র রসূল! পরকালে আমার ঠিকানা কোথায় হবে? নবীজী বললেন-জাহান্নাম। অতঃপর আবদুল্লাহ বিন হুযাফা বললেন- ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার বাবা কে? নবীজী বললেন-তোমার বাবা হুযাফা। নবীজী আবারও জোর তাকীদ দিয়ে বললেন, তোমরা প্রশ্ন কর, প্রশ্ন কর। অতঃপর ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নবীজীর বরাবর সামনে গিয়ে বসলেন আর বললেন- আমরা সন্তুষ্ট আল্লাহ্ কে রব হিসেবে পেয়ে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে রসূল হিসেবে পেয়ে। তিনি এসব কথা বলার সময় নবীজী চুপ রইলেন অতঃপর বললেন -সেই সত্ত্বার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ আমার এই দেয়ালের সামনে এইমাত্র বেহেশত ও দোযখ হাজির করা হয়েছে, যখন আমি নামায পড়ছিলাম, আজকের মত কোন ভাল-মন্দকেও দেখিনি। (সূত্রঃ- বুখারী শরীফ হাদীস নং-৬৮৬৪ কিতাবু ই'তিসাম বিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ, মুসলিম শরীফ হাদীস নং-২৩৫৯)

এভাবে অসংখ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইলমে গায়েব'র অধিকারী ছিলেন। অবশ্যই তা আল্লাহ্ প্রদত্ত। আর সত্ত্বাগত আলিমূল গায়েব হলেন একমাত্র আল্লাহ্। আর রসূলের ইলমে গায়েব আল্লাহ্ প্রদত্ত। যেমন এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ-

অর্থাৎ- "হে সাধারণ লোকগণ! আল্লাহ্ তা'আলার শান যে, তিনি তোমাদেরকে ইলমে গায়েব দান করবেন, তবে রসূলগণের মধ্য হতে তিনি যাকে চান তাকে অদৃশ্য জ্ঞানের জন্য মনোনীত করেন।"

রসূলদের মধ্য হতে যদি আল্লাহ্ পাক কাউকে নির্বাচিত করেন, তাহলে সর্ব প্রথমে কাকে নির্বাচিত করবেন তা সহজেই অনুমেয়।

মূলতঃ গবেষণা করলে দেখা যায়, নবীজীর বর্ণাঢ্য জীবনে প্রতিটি অধ্যায়ে রয়েছে বিশ্ব মানবতার জন্য শিক্ষণীয় বিষয় আর অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচীতে দেখা যায়, ইলমে গায়েবের প্রভাব। পবিত্র কোরআন-হাদীসের আলোকে সংক্ষেপে এতটুকু আলোচনা করলাম। বিস্তারিত জানার জন্য দেখতে পারেন জা-আল হক্বঃ প্রথম খন্ড (বাংলা সংস্করণ)।

www.sunnibarta.com

মাহে শাওয়াল

ঈদুল ফিতরের মাস বিশ্ব মুসলিমের অপার আনন্দের মাস শাওয়াল। এক মাস সিয়াম সাধনার পর মুসলিম উম্মাহ্‌র দ্বারে সিয়াম-সাধনার সমাপনী আনন্দ ও শুকরিয়া এবং খোদাভীরু জীবনের প্রতিফলনের দাবী নিয়ে মাহে শাওয়াল সমাগত হয়েছে।

হিজরী সনের দশম এবং হজ্বের প্রস্তুতি মাস হিসেবেও মাহে শাওয়াল সবিশেষ তাৎপর্যবহ। আল্লাহ্‌র প্রেমে উজ্জীবিত হবার সত্যিকার মানসিক শক্তি যেহেতু পবিত্র রমজানের পূর্ণ এক মাস সিয়াম সাধনায় অর্জিত হয়েছে। তাই আসন্ন হজ্ব ও উমরাহ পালনে প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য শাওয়াল উপযুক্ত সময়। যখন মাহে শাওয়ালের বাঁকা চাঁদ পশ্চিম আকাশে উদিত হয় তখন থেকে শুরু হয় পরের দিবসের আনন্দের! ঈদের ঘনঘটা। কিন্তু এরই মাঝে আল্লাহ্‌র আবেদ বান্দাগণের নিদ্রাহীন রাত অতিবাহিত হয় নফল নামায, তিলাওয়াত, জিকির ও দরূদ শরীফ এবং আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থণার মধ্য দিয়ে।

ঈদুল ফিতরের এ রাতে স্বীয় বান্দাদের জন্য আল্লাহ্‌র বিশেষ দান বা অনুগ্রহের প্রতীক পাঁচরাতের অন্যতম। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রত্যাশীরা এ রাতে তাই এবাদতে রত থাকেন। এ রাতের জন্য বিশেষভাবে চার রাকাত (দুই রাকাত বিশিষ্ট) নফল নামাযের নিয়ম নির্দেশ করা হয়েছে যে, প্রতি রাকাতে ২১ বার সূরা ইখলাস দ্বারা দুই নিয়্যতে চার রাকাত নামাজ আদায়কারীর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বেহেশতের আটটি ফটক উম্মুক্ত করবেন এবং দোযখ হতে পরিত্রাণ দেবেন।

ঈদের দিনে করণীয়

এ দিন দুই রাকাত ঈদুল ফিতরের নামায আদায় করা প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের জন্য ওয়াজিব। বিনা কারণে এ নামায পরিত্যাগ করা গোমরাহী ও বিদ'আত। তবে মুসাফির, অসুস্থ ব্যক্তি, ক্রীতদাস, অন্ধ, নারী ও নাবালেগের জন্য এ নামায বাধ্যতামূলক নয়।

ফিত্‌রা

যারা স্বচ্ছল, অর্থবান তথা শরীয়ত নির্ধারিত ধন-সম্পদের অধিকারী তাদের উপর এ দিন ফিতরা প্রদান করা ওয়াজিব। ফিতরা হলো জন প্রতি ২ কেজি ৫০ গ্রাম (প্রায়) পরিমাণ গম বা সমমূল্য অথবা তার দ্বিগুণ যব বা সমমূল্য। এ ফিতরা নামাযে যাওয়ার আগে আদায় করা মুস্তাহাব।

এ ছাড়া নামাযের পূর্বে নখ কাটা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে ভাল জামা-কাপড় পরিধান করে আতর খুশবু ব্যবহার করা, হেঁটে এক রাস্তা দিয়ে গিয়ে ভিন্ন পথে ঈদগাহ হতে প্রত্যাবর্তন করা, ঈদগাহে যাওয়ার কালে অনুচ্চ স্বরে তাকবীর- "আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লাহিল হামদ" পাঠ করা নামাযান্তে মুসলমানদের সাথে মুসাফাহা ও মুয়ানাকা (হাত মিলানো ও গলাগলি করা) ইত্যাদি মুস্তাহাব। নবীজি ঈদের নামাযে যাওয়ার আগে কিছু মিষ্টি খাওয়ার পূর্বে বিজোড় সংখ্যায় খেজুর খেতেন।

এদিন পাড়ায় পাড়ায়, বিভিন্ন ঈদাগাহ বা ময়দানে এ নামায অনুষ্ঠিত হয়। (অবশ্য বৃষ্টি বা অন্য কোন অসুবিধার কারণে মসজিদের ভিতর নামায আদায় করা যায়) ছয় তাকবীর বিশিষ্ট ওয়াজিব এ দুই রাকাত নামায আদায়ের জন্য একদিকে বান্দা হাজির হন, অন্যদিকে আল্লাহ্ তায়ালা ফেরেশতাদের বলেন- যে শ্রমিক নিজের অর্পিত দাযিত্ব পালন করে তার প্রাপ্য কি হওয়া উচিত? উত্তরে ফেরেশতারা বলেন- কাজের পূর্ণ প্রতিদানই তাকে প্রদান করা উচিত। এরপর আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন-

আমার বান্দাগণ আমার নির্দেশ (রোযা) পালন করেছে এবং অতি নম্রতার সাথে ক্রন্দনরত অবস্থায় নামায ও দোয়ার জন্য ঈদগাহে সমবেত হয়েছে। আমি আমার ইজ্জতের শপথ করে ঘোষণা করছি তাদের দোয়া কবুল করব এবং তাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করে দেব।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঈদের দিন ফেরেশতাগণ রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাড়িয়ে এ মর্মে আহবান করতে থাকেন যে, হে মুসলমানগণ! বিগত রমজানের রাতে যারা এবাদত করেছে এবং দিনসমূহে রোযা রেখেছে এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ মোতাবেক গরীব-দুঃখীদের খেতে দিয়েছ, আজ তারা পুরস্কার গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হও।

www.sunnibarta.com

অতঃপর মুসলমানগণ যারা ঈদের নামায আদায় করেন তাদের উদ্দেশ্যে তখন একজন ফেরেশতা উচ্চ আওয়াজে বলেন যে, তোমাদের প্রভু ও প্রতিপালক আল্লাহ্ পাক তোমাদের ক্ষমা করেছেন। তোমরা পুতঃ পবিত্র দেহ মন নিয়ে ঘরে প্রত্যাবর্তন কর।

ঈদুল ফিতর নামাযের নিয়্যত

"নাওয়াইতু আন উসাআল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকাআতাই সালাতিল ঈদিল ফিতরি মাআ ছিত্তাতে তাকবীরাতি ওয়াজিবিল্লাহি তা'আলা ইক্বতিদাইতু বিহাজাল ইমাম মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শরীফাতি আল্লাহু আকবর"।

নামাযের নিয়ম

নিয়্যতের পর ইমামের সাথে তাকবীরে তাহরীমা আল্লাহু আকবর বলে কানের গোড়া পর্যন্ত হাত তুলে নামায শুরু করা হবে। তারপর অনুচ্চ স্বরে ছানা পাঠ করে তিনবার ইমামের সাথে আল্লাহু আকবর বলে তাকবীরে যায়েদা বা অতিরিক্ত তাকবীর বলার সময় স্বীয় হাত কান পর্যন্ত উঠাতে হবে। প্রথম দুই বার হাত তুলে ছেড়ে দিবে এবং তৃতীয় বার হাত বেঁধে নিতে হবে। এরপর ইমাম সাহেব যথা নিয়মে উচ্চস্বরে কেরাত পড়বেন এবং প্রথম রাকাতের পর দ্বিতীয় রাকাত আরম্ভের জন্য দাঁড়িয়ে ইমাম সাহেব প্রথমে কেরাত পড়ে নেবেন এরপর রুকুতে যাওয়ার পূর্বে তিনবার তাকবীরে যায়েদা বলার সময় মুক্তাদীগণও ইমাম সাহেবের অনুবর্তী হবেন এবং অনুচ্চস্বরে তাকবীর পড়তে পড়তে কান পর্যন্ত হাত তুলে ছেড়ে দিবেন। এরপরই রুকুর তাকবীর বলা হলে রুকুতে যাবেন। তারপর নিয়মানুযায়ী এ রাকাতও সমাপ্ত করার পর ইমাম সাহেব খোতবা প্রদান করবেন। ঈদের ও জুমার নামাযের খোতবা প্রদান সুন্নাত, কিন্তু শুনা ওয়াজিব এবং এ সময় কথা বলা বা অন্য কাজ করা এমনকি তাসবীহ-তাহলীল ও কোরআন তিলাওয়াত করাও সম্পূর্ণরূপে নিষেধ। খতীবের খোতবা শুনা না গেলেও চুপ থাকতে হবে। অন্যথায় গুনাগার হবে।

ঈদের খোতবার পূর্বে ইমাম সাহেব মিম্বরে না বসে খোতবা শুরু করে দেয়া সুন্নাত এবং প্রথম খোতবার পূর্বে নয়বার দ্বিতীয় খোতবার পূর্বে সাতবার এবং মিম্বর হতে অবতরণের পর চৌদ্দবার আল্লহু আকবর (চুপে চুপে) পাঠ করা সুন্নাত। নামায ও খোতবার পর মুনাজাত শেষে উপস্থিত সকলের শুভেচ্ছা বিনিময় ও গলাগলিতে মুসলমানদের গভীর সম্প্রীতি ও ভালবাসার প্রকাশ ঘটে। যা ঈদোত্তর সকল ক্ষেত্রে প্রতিফলিত করা হলে আমাদের সমাজ ও দেশ হতে হিংসা, ঘৃণা ও বিদ্বেষ দূরীভুত হয়ে যেত।

ঈদের দিন নির্দোষ আনন্দ ও উৎসব করারই দিন। এ দিনে শরীয়ত পরিপন্থী আনন্দ ও উৎসব ঈদের ধর্মীয় গুরুত্বের হানি করে। এতদসত্ত্বেও আমাদের দেশে ঢাকঢোল পিটিয়ে ঈদোপলক্ষে নগ্ন ছবি ও নাচগানে ভরপুর চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর দিকে আহবান করা হয় এবং রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত টেলিভিশনে ঈদের বিনোদনের নাম প্রায়শঃস্থুল বিনোদনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এসব দেখে মনে হয় যে, রোযার এক মাসের সাধনা তাসবীহ-তাহলীল, নামায, দু'আ-দুরূদ তথা সামগ্রিক ধর্মীয় সংযত শেষ হবার সাথে সাথে দ্বীনী চিন্তা-চেতনা মূল্যবোধকে বিসর্জন দেয়াটাই যেন নীতি ও নিয়ম। বস্তুতঃ এইগুলি ঈদের ধর্মীয় মর্যাদা ও গুরুত্বের প্রতি স্পষ্টত এক চ্যালেঞ্জ। সকলে এ ব্যাপারে ভেবে দেখবেন বলে আশা করি।

শাওয়ালে নফল রোযা

ঈদের দিন ব্যতীত শাওয়ালের সারা মাসের মধ্যে ছয়টি নফল রোযা রাখার জন্য হাদীস শরীফে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। নুন্যতম একটি রোযাও যদি কেউ পালন করে তবে তার আমল নামায় এক হাজার রোযার সওয়াব প্রদান করা হবে বলে হাদীস শরীফে জানানো হয়েছে। এ মাস থেকে শুরু হবে হজ্ব যাত্রীদের প্রস্তুতি। অনেকে রওয়ানা হবেন পবিত্র ভূমির উদ্দেশ্যে। ঐ সৌভাগ্যবানদের প্রতি আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।

এ মাসে ওফাতপ্রাপ্ত ক'জন বুযূর্গ

৬ শাওয়াল : খাজা উসমান হারূনী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

১২ শাওয়াল : বাদশাহ্ আওরঙ্গজেব আলমগীর (জিন্দাপীর)

১০ শাওয়াল : মুফতী সৈয়্যদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান

১ শাওয়াল : খাজা আরিফ রিওগিরী রহমাতুল্লাহি আলায়হি

১ শাওয়াল : শাহ্ আবূ সাঈদ মুজাদ্দেদী দেহলভী

www.sunnibarta.com

ঈদুল ফিতর ও মাহে শাওয়ালের তাৎপর্য

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

চান্দ্র বর্ষের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ মাস হচ্ছে শাহে শাওয়াল। রহমত, মাগফিরাত ও দোযখ থেকে মুক্তি লাভের মাস রমযানের ফলাফল প্রকাশের মাস হবার যোগ্যতাসম্পন্ন হচ্ছে 'শাওয়াল'। এ মুবারক মাসের চাঁদের খুশী বছরের অন্য সব মাসের চাঁদগুলো অপেক্ষা বেশি। ঈদের চাঁদ তো এমনি যে, সেটা বারবার দেখতে ইচ্ছা হয়। 'ঈদ মানে প্রত্যাবর্তনকারী, বারবার আগমনকারী দিন, খুশী ও আনন্দের দিন। দীর্ঘ একমাস যাবৎ কঠোর সাধনা ও পরীক্ষার পর যখন ফল সাফল্যের সাথে প্রকাশ পায়, তখনতো স্বভাবতই খুশী ও আনন্দেরই হয়ে থাকে। মাহে রমযানের পরীক্ষাটাও এমনই যে, প্রত্যেক পরীক্ষার্থীই সাফল্যমন্ডিত হয়। যেমন মহান আল্লাহ্ এরশাদ করেন -

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

(নিশ্চয় যে আত্মশুদ্ধির জন্য সচেষ্ট হয়েছে সে সফলকাম হয়েছে)। আর যে সাফল্য আল্লাহ্ র পক্ষ থেকে অর্জিত হয়, তাতে প্রকৃত খুশী পাওয়া স্বাভাবিক। কারণ, এটা এমন এক সাফল্য, যা কখনো বিলীন হবার নয়।

অদ্বিতীয়ত ইসলাম অন্যতম ভিত্তি 'হজ্জ'- মাসগুলো শাওয়াল থেকেই আরম্ভ হয়। তৃতীয়ত : এটাকে 'ফিতর' বা ফিতরার মাসও বলা হয়। এ মাসের প্রথম দিন ঈদুল ফিতরের দিন, পাপরাশির ক্ষমা পাবার দিন। তাই এ মাসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরিসীম।

অন্যান্য জাতির ঈদ ও মুসলামনদের ঈদ

প্রায় সব জাতির নিকট কোন না কোন দিন খুশীরই হয়ে থাকে। ওই দিনে ওই সব জাতি নিজেদেরকে তাদের ধর্মীয় এ চারিত্রিক বাঁধাধরা নিয়মাবলী থেকে মুক্ত হলে মনে করে। তাদের মতে যেন উৎসব মাত্রই নিয়ম-কানুন থেকে মুক্ত হবারই নাম। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। মুসলমানদের জন্য যখন কোন খুশীর দিন আসে, তখন ওই দিন বা দিনগুলোতে তাঁদের চারিত্রিক মূল্যবোধ আরো বেশি জাগ্রত হয়। হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনা মুনাওয়ারায় তাশরীফ আনয়ন করলেন, তখন দেখলেন যে, মদীনাবাসী বছরে দু'টি দিন এমনভাবে দেখলেন যে, মদীনাবাসী বছরে দু'টি দিন এমনভাবে নির্ধারণ করে রেখেছে যে, ওই দিন দু'টিকে তারা খেলাধুলা ও আনন্দ উৎসবের মধ্যে অতিবাহিত করে। হুযূর তাদের উদ্দেশ্যে এরশাদ করলেন, ইসলাম কোন পিপথগামিতা ও খেলা-তামাশার অনুমতি দেয় না। ইসলাম মানুষের ক্বলবে 'রূহানিয়াত' এবং স্বভাবে আভিজাত্য-ভদ্রতা ও নেকী পয়দা করতে চায়। সুতরাং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম জাহেরী যুগের ওই সব উৎসবের পরিবর্তে দু'টি দিন খুশীর জন্য নির্ধারণ করলেন - ১. ঈদুল ফিতর ও ২. ঈদুল আযহা (ক্বোরবানীর ঈদ)। তিনি এ দুটি দিনে খুশী উদ্‌যাপনের নিয়মাবলীও নির্ধারণ করে দিলেন- এ উভয় দিনে অবশ্যই তারা আল্লাহ্ তা'আলার হামদ ও সানা বেশি পরিমাণে করে, আর যেন পাঠ করে 'আল্লা-হু আকবার, আল্লাহু আকবার লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার আল্লা-হু আকবার ওয়া লিল্লা-হিল হামদ। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কোরআনে মজীদে এরশাদ করেন -

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

অর্থাৎ- "এবং তোমরা পূর্ণ কর গুনা, আর এর উপর যে তিনি তোমাদেরকে হিদায়াত দিয়েছেন, তাঁর মহত্ব বর্ণনা কর অন্য আয়াতে ঘোষণা করেছেন -

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ"

(আমার) শোকর কর, তবে আমি নিয়ামাতরাজি আরো বাড়িয়ে দেব, আর যদি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, তবে আমার শাস্তি কঠিন। মুসলমানদের বৈশিষ্ট হচ্ছে তারা দুঃখ ও সুখ তথা যে কোন সময়েই আল্লাহ্ তা'আলার শোকর আদায় করে। তিনি যে অবস্থাতেই রাখুন না কেন, তাতে তারা সন্তুষ্ট থাকে। বস্তুতঃ দুঃখ ও সুখ

www.sunnibarta.com

উভয়ই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসে। তাই কখনো অকৃতজ্ঞতার বাক্য মুখে উচ্চারণ করা উচিত নয়। প্রতিটি অবস্থা বাহ্যিক দৃষ্টিতে যতই মন্দ হোক না কেন, তাতেও রয়েছে মঙ্গল। এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনা অবতারণা করছি- এক বাদশাহ্‌র মন্ত্রীবর্গ ওই পথে যাতায়ত করতেন, যে পথের ধারে এক ভিক্ষুক বসে আল্লাহ্‌র যিকরে রত থাকত। এক ফক্বীর (ভিক্ষুক) প্রতিদিন ওই মন্ত্রীবর্গকে অতি জাঁকজমকপূর্ণ পোশাকে যাতায়াত করতে দেখত। একদিন ভিক্ষুকটি অভিযোগের বাক্য মুখে উচ্চারণ করল, "হে আল্লাহ্‌! তোমার ইবাদত তো আমি বেশি করি, আর আমার ভাগ্যে কাপড়ও যথেষ্ট পরিমাণে জুটছে না। এসব মন্ত্রী ও রাজন্যবর্গ হচ্ছে আস্ত দুনিয়াদার, তোমার ইবাদত ও স্মরণের প্রতি একেবারে উদাসীন! কিন্তু তুমি তাদেরকে সব ধরণের স্বাচ্ছন্দ্য দিয়ে রেখেছো! এরপর সময় অতিবাহিত হচ্ছিল। কিছুদিন পর ওই রাজ্যের উপর অন্য রাজ্যের বাদশাহ হামলা করল। মন্ত্রী ও রাজন্যবর্গ গ্রেফতার হল। অক্রমণকারীরা তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাচ্ছিল রাজ্যের গোপন অবস্থাদি সম্পর্কে বলার জন্য। আর তারা অসহনীয় কষ্ট সহ্য করে যচ্ছিল। তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা ওই ভিক্ষুকের মধ্যে প্রেরণা যোগাচ্ছিলেন, যাও! দেখ, ওই মন্ত্রীবর্গের দুরাবস্থা।

তাই, আল্লাহ্‌ যাকে যেই নিয়ামাত দিয়েছেন ওই নিয়ামাতের শোকর আদায় করা চাই। হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "মানুষের উচিত সব সময় নিজের নিম্ন পর্যায়ের মানুষকে দেখা; নিজের চেয়ে উঁচুতর অবস্থার লোকের দিকে না দেখা। অন্যথায় নিজের সঙ্গীন অবস্থার জন্য মনে আফসোস সৃষ্টি হবে। ফলে, সে মানসিক যন্ত্রণায় ভুগবে। তাকে তার নিচের অবস্থার লোকদের দিকে দেখলে নিজের মধ্যে অধিকতর নিয়ামাত দেখতে পাবে এবং তজ্জন্য আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মনোভাব জন্মাবে। এ প্রসঙ্গে হযরত শায়খ সা'দী রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র একটি ঘটনা প্রণিধানযোগ্য।

এক দিন, ছাত্রজীবনে লাগাতার সফর করতে করতে তাঁর পায়ের জুতো ছিঁড়ে গিয়েছিল। ধারালু পাথরগুলো তাঁর পদযুগলকে ক্ষত বিক্ষত করে ছাড়ল। তিনি তখন আরেক জোড়া জুতো কিনতে পারলেন না। কষ্ট সহ্য করতে না পেরে এক পর্যায়ে আল্লাহ্‌ পাকের দরবারে অভিযোগ করলেন- হে আল্লাহ্‌! আমি তোমার রাস্তায় ইলমে দ্বীন হাসিল করার জন্য বের হয়েছি। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করছি। অথচ, আমি পায়ের জুতো পর্যন্ত পাচ্ছি না। হযরত শায়খ সা'দী বললেন "আমি এমতাবস্থায়ই খালি পায়ে কুফার জামে মসজিদে গিয়ে পৌঁছলাম। জুমার নামাযের পর দেখতে পেলাম - দরজায় একটি লোক বসে ভিক্ষা করছে। তার উভয় পা কর্তিত। একটি পাও তার নেই। শায়খ সা'দী বলেন, আমি তাৎক্ষণিকভাবে পূনরায় মসজিদে প্রবেশ করলাম আর সেজদায় অনবত হয়ে কেঁদে কেঁদে আল্লাহ্‌র দরবারে আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌! এমন লোকও আছে, যার ভাগ্যে পা-ও নেই।

সুতরাং, মানুষের উচিত, সব সময় যে কোন অবস্থাতে আল্লাহ্‌ তা'আলার শোকর আদায় করা। এমন করা উচিত নয় যে, মুসীবত আসলে আল্লাহ্‌র স্মরণে রত হবে, আর যখন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আসবে তখন আল্লাহ্‌ তা'আলাকে ভুলে যাবে। যেন সে আল্লাহ্‌র সাথে কোন অঙ্গীকারই করেনি। দুখের হলেও সত্য যে, আমাদের ঈদের দিনগুলোতেও যেন এমনি উদাসীনতা। দেশের প্রচার মাধ্যমগুলোকেও যেন এমনি স্বাধীনতা দিয়ে দেওয়া হয় যে, তারা মুসলমানদের ঈদকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের অনৈসলামিক বিনোদনের প্রোগ্রাম সাজিয়ে দিনের পর দিন প্রচার করতে থাকে। তাদের মনে রাখা উচিত- ঈদ মুসলমানদেরই উৎসব। ঈদের দিনগুলোতে ইসলামসম্মত খুশীই উদ্‌যাপিত হওয়া চাই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, প্রকৃত খুশীর দিনে মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য হচ্ছে আল্লাহ্‌কে বেশি পরিমাণে স্মরণ করা, অধিক হারে তাঁর শোকর আদায় করা। কিন্তু আফসোস! যেই ইবাদত বান্দেগীর পর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নিয়ামাত ও পুরস্কার ঘোষণার কারণে এ খুশী, ওই ইবাদত কবুল হল কিনা ও আদৌ ওই ইবাদত পালনে সক্ষম হল কিনা ইত্যাদির জন্য চিন্তা-ভাবনা, অনুশোচনা ও আল্লাহ্‌র দরবারে কান্নাকাটি করার দরকার। কিন্তু এর স্থলে শয়তানী পন্থায় অহেতুক খুশী উদযাপনের মত নির্লজ্জতা প্রদর্শন করা হয়। আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের প্রিয়পাত্র, বেহেশ্‌তের

www.sunnisunta.com

সুসংবাদপ্রাপ্ত হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে ঈদের দিন ঘরের দরজা বন্ধ করে নিজের ইবাদত-বন্দেগী কবুল হয়েছে কিনা আশংকা করে কান্নাকাটি করতে দেখা গেছে, সেখানে আমরা- আপনারা কোন পর্যায়ে আছি? হযরত ওমর ফারুক্ব তো সেদিন স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন "হ্যাঁ, খুশী তাদেরই জন্য যাদের ইবাদত কবুল হয়েছে। আমি তো জানি না আমার ইবাদত আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হয়েছে কিনা।" অর্থাৎ কবুল না হলে খুশী কিসের? তখন তো উল্টো শাস্তি ভোগের ভয় থেকে যায়; যার জন্য কান্নাকাটির বিকল্প কি থাকতে পারে?

অথচ, আমাদের ঈদগুলোতে দেখা যায়, রঙ-তামাশা, সিনেমা-থিয়েটার, বিনোদনের আরো কত আয়োজন! বস্তুত এগুলো ইসলামী সংস্কৃতি নয়। কিন্তু বর্তমান মুসলমানদের অবস্থা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। দুনিয়ার এমন কোন নেতিবাচক ব্যাধি নেই, যা আমাদের মুসলিম সমাজে সংক্রমিত হয়নি। বস্তুতঃ ওইগুলোর স্থায়ী ও কার্যকর চিকিৎসা ও প্রতিকারের জন্যই রমযানের সিয়াম-সাধনা ও অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগী; কিন্তু এর প্রতিফলন পরিদৃষ্ট না হয়ে সমাজ সংস্কারের সব পথই রুদ্ধ হয়ে আসছে বলে মনে হচ্ছে।

ঈদের দিন'র ধর্মীয় গুরত্বঃ

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত- ঈদের দিন আল্লাহ্ তা'আলা আপন রোযাদার নেককার বান্দাদের নিয়ে গর্ব করেন, আর ফিরিশতাদের উদ্দেশ্যে বলেন- ওহে ফিরিশতারা বল, ওই মজদুরকে কি পারিশ্রমিক দেওয়া যেতে পারে, যে তার উপর নির্ধারিত কাজ ভালভাবে আঞ্জাম দিয়েছে? ফিরিশতাগণ আরয করেন, হে আল্লাহ্! তার পুরস্কার (প্রতিদান) হচ্ছে মজদূরকে তার পারিশ্রমিক পূর্ণাঙ্গরূপে দেওয়া হোক। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন, হে ফিরিশতারা, শোন! আমার বান্দারা (নারী-পুরুষ) আমার বিধান পুরোপুরিভাবে পালন করেছে। এটা শুনে ফিরিশতারা সমস্বরে 'লাব্বায়েক' বলে বান্দাদের আমলের কথা স্বীকার করেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমার শপথ- আমার সম্মান, মহত্ব, দানশীলতা, বদান্যতা, উচ্চ মর্যাদা ও উচ্চ প্রশংসার! আমি রোযাদার বান্দাদেরকে, যারা ঈদের দিনের দো'আ করে, তাদের দো'আগুলো কবুল করে নেব। আর ঘোষণা করব যাও বলে দাও, হে আমার বান্দারা! আমি তোমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিলাম। আর তোমাদের গুনাহগুলোকে নেকীতে পরিবর্তিত করে দিলাম।

বর্ণনাকরী হযরত আনাস বলেন, রোযাদারগণ যারা ঈদের দিন দো'আ করে, তাদের দো'আ কবুল হয়, আর এ ক্ষমাপ্রাপ্ত বান্দাগণ নিজেদের গুনাহসমূহ থেকে পাক-সাফ হয়ে ঈদগাহ থেকে আপন আপন ঘরে ফিরে যায়। *বায়হাক্বী, কৃত শু'আবুল ঈমান, মিশকাত শরীফ ইত্যাদি*

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, ঈদের দিন সকালে ঈদের নামাযের পূর্বে খেজুর, হালুয়া ও মিষ্টি জাতীয় কিছু খেয়ে নেওয়া সুন্নাত আর ঈদদাহে এক রাস্তা দিয়ে গিয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসাও সুন্নাত। এর হিকমত বা রহস্য এও হতে পারে যে, ঈদের দিন রোযাদার যেন নবজাত শিশুর ন্যায় পাপমুক্ত হয়ে নতুন জীবনে পদার্পণ করছে। তাই নবজাতের ন্যায় প্রথমে তাকে মিষ্টি জাতীয় বস্তু খাওয়ানো হচ্ছে। আর ঈদের ময়দানে এক অবস্থায় গিয়ে সেখানে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 'মাগফুর (ক্ষমাপ্রাপ্ত) ও অনেক সাওয়াবের অধিকারী হয়েছে। তাই, নতুন সাজে অন্য পথেই আজ সে ঘরে ফিরছে।

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র বর্ণনায় আছে- হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের নামাযের পূর্বে প্রথমে বিজোড় সংখ্যক খেজুর আহার করতেন। ইমাম হাকিম হযরত ইবনে ওবায়দের বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, ঈদুল ফিতরের নামাযের পূর্বে রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তিনটি, পাঁচটি, সাতটি অথবা কম বেশি খেজুর আহার করতেন। মুহাদ্দিসগণ এ খেজুর খাওয়ার হিকমত এও বর্ণনা করেছেন যে, খেজুর দ্বারা দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়, যা রোযা রাখার ফলে হ্রাস পেয়েছিল। এ কারণে খেজুর খাওয়া মুস্তাহাব। তাছাড়া, এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, শিরনী

(মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য) হৃদয়কে নম্র করে এবং তা ঈমানী মেজাযের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ। যেমন কথিত আছে যে মানুষ হালকা-পাতলা গড়নের হয়ে থাকে তাকে দেখতে সুন্দর দেখায়। যদি কেউ স্বপ্নে মিষ্টি জাতীয় জিনিস ও মিষ্টি ফল ইত্যাদি দেখে, তবে এর ব্যাখ্যা হয় সে সহসা ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারবে। এ করণে মধু ও খেজুর দিয়ে ইফতার করা উত্তম। তদুপরি, খেজুরে রয়েছে অনেক উপকারিতা। মদীনা মুনাওয়ারার খেজুরের কথাই তো আলাদা।

প্রসঙ্গতঃ ঈদের দিন ঈদের নামাযের পূর্বে গোসল করাও সুন্নাত। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর কিতাব 'জম'উল জাওয়ামি'তে ইমাম শা'বীর বরাতে হযরত যিয়াদ ইবনে আয়ায আশ্'আারীর বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তিনি আপন সম্প্রদায়ের লোকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, "রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সমস্ত সুন্নাত তোমরা পালন করছ, কিন্তু দু'ঈদে তোমরা গোসল করছ না! অথচ এটাও সুন্নাত। 'আর ঈদুল ফিতরের নামাযের জন্য যাওয়ার পথে নিম্নস্বরে তাকবীর' পাঠ করা সুন্নাত। তাকবীর হচ্ছে 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ।'

ঈদুল ফিতরের সামাজিক গুরুত্ব ঃ

ঈদ মুসলিম ভ্রাতৃত্বের প্রতীক। আজ ধনী দরিদ্রের মধ্যে ভেদাভেদ নেই, আভিজাত্যের অহংকার আজ ভূমিস্যাৎ। সবাই এক কাতারে দাঁড়িয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঈদের নামায আদায় করে। ঈদের নামায শেষে একে অপরের সাথে অনায়াসে কোলাকুলি করে, করমর্দন করে। প্রত্যেকের ঘরের দরজা আজ উন্মুক্ত। প্রত্যেকের ঘরে প্রত্যেকের দা'ওয়াত। আত্মীয়তার বন্ধনও আজ নতুন করে গ্রথিত হয়। কারো সাথে ইতোপূর্বে মনোমালিন্য থাকলে তাও ঈদের শুভেচ্ছার মাধ্যমে দূরীভূত হয়ে যায়; পুনর্বার স্থাপিত হয় ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব। ঈদের খুশীর এ আমেজ নিজ নিজ নির্দিষ্ট গন্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও বিস্তৃতি লাভ করে। ঈদকে কেন্দ্র করে পারস্পরিক বন্ধুত্ব আরো জোরদার হয়। ঈদের খুশী যাতে সর্বস্তরের মুসলমান উপভোগ করতে পারে তজ্জন্য ইসলাম সুন্দর বিধান দিয়েছে। ধনীদের সাথে সাথে বিত্তহীনরাও যাতে সানন্দে ঈদ করতে পারে, তজ্জন্য ইসলামে ধনবানদের উপর যাকাত তো ফরয আছেই, ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সাদক্বাতুল ফিতর (ফিতরা)'র বিধানও দেওয়া হয়েছে। ঈদের নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে যাবার আগে ফিতরা আদায় করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে, যাতে গরীবরাও নতুন জামা-কাপড় পরে ঈদ উদযাপন করতে পারে, করতে পারে ঈদের অন্যান্য আয়োজনও। যাদের উপর যাকাত ও ফিতরা ওয়াজিব হয়েছে তাদেরকে তা যথাযথভাবে আদায়ের জন্য জোর তা'কীদ দেওয়া হয়েছে, অন্যথায় কঠিন শাস্তি ও ক্ষতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। বাস্তব ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, যদি মুসলিম সমাজের প্রতিটি ধনবান লোক তাদের উপর আরোপিত যাকাত ও ফিতরা সঠিকভাবে আদায় করে, তবে সমাজের গরীব শ্রেণীর দুঃখ ঘুঁচে যেত। আর ধনীরা রক্ষা পেত পার্থিব জীবনের অগণিত ক্ষতি থেকে, পরকাল হত সাফল্যমন্ডিত ও সম্মানের। কারণ, এমন লোকও আছে, যে দুনিয়ায় অর্থ-সম্পদ দ্বারা অতি সম্মানিত, অথচ যাকাত না দেওয়ার কারণে সে পরকালে হবে অতি লাঞ্ছিত। আল্লাহ্ পাক এরশাদ ফরমায়েছেন "যে সব লোক সঞ্চয় করে স্বর্ণ-রৌপ্য এবং ওইগুলোকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না, অর্থাৎ যাকাত পরিশোধ করেনা, তাদেরকে সংবাদ দাও যন্ত্রাদায়ক শাস্তির। যেদিন উত্তপ্ত করা হবে-ওই স্বর্ণ-রৌপ্য জাহান্নামের আগুনে, তারপর তা দ্বারা দাগানো হবে তাদের কপালে, করটে ও পৃষ্ঠদেশে। এ হচ্ছে যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিলে! এখন স্বাদ গ্রহণ কর ওই সঞ্চয়ের। (আল ক্বোরআন)

আর ফিতরা প্রসঙ্গে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ফিতরা পরিশোধ না করলে রোযাদারের রোযা আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তীতে

www.sunnibarta.com

www.sunnibarta.com

ঝুলন্ত থেকে যাবে; কবুল হবে না, ইত্যাদি। কিন্তু দুঃখের হলেও সত্য যে, আজকাল নানা বাহানা অজুহাতে ধনীরা যাকাত না দিয়ে পার পেতে চায়। তাছাড়া, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও গরীব-অভাবীদের প্রতি নজর দেয় না। মনোপলি (monopoly) ব্যবস্থা, সিন্ডিকেট কিংবা মজুদদারী ও মুনাফাখোরী ইত্যাদির মাধ্যমে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে নিজেরা ধনের পাহাড় গড়ে, আর অন্যদের ঠেলে দেয় নানা সমস্যা ও দারিদ্র্যের দিকে। যাকাতকে মনে করে দরিদ্রের উপর এক বিরাট বদান্যতা। তাও পৌঁছাতে গিয়ে নানা লৌকিকতা ও যাকাতভোগীদের লাঞ্ছনার সৃষ্টি করা হয়।

তাই, আজকে সময় এসেছে- আমাদের প্রিয়নবী কি শিক্ষা দিয়েছেন, বিশেষ করে ঈদ উদ্‌যাপনের ক্ষেত্রে, তা পর্যালোচনা করার ও তদনুযায়ী আমল করার। একদা ঈদের নামায শেষে প্রিয়নবী ফেরার সময় ঈদগাহের এক কোণে একটি কান্নারত ছেলেকে দেখতে পান। হুযূর তার কাছে গিয়ে তার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে স্নেহভরে জিজ্ঞেস করলেন, তার কাঁন্নার কারণ। আদর পেয়ে ছেলেটির কান্না থামল আর বলল- "এক যুদ্ধে আমার বাবা মারা গেছেন, মাও বেঁচে নেই। তারপর আবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। দয়াল নবী ছেলেটিকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে সান্ত্বনা দিলেন। তারপর তাকে ঘরে নিয়ে এলেন আর উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন, "আমি তোমাদের জন্য এই ছেলেটাকে নিয়ে এলাম। হযরত আয়েশাও শিশুটিকে কোলে তুলে নিলেন। নিজ হাতে গোসল করালেন। নতুন জামা পরালেন। আদর করে খাবার খাওয়ালেন। নবী তনয়া হযরত ফাতিমাহ যাহরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা'ও তাকে আদর করলেন। এ হল নবীর সুন্নাত, তাঁর পরিবার-পরিজনের অনুপম আদর্শ।

ঈদের খুশী উদযাপনের সুন্নাতসম্মত পন্থায় এও রয়েছে যে, বড়দের প্রতি ছোটরা সম্মান প্রদর্শন করবে এবং সালামের মাধ্যমে অভিভাদন জানাবে, আর বড়রা ছোটদের প্রতি উজাড় করে দেবেন আন্তরিক স্নেহ-মমতা। এটাই চলে আসছে যুগ-যুগ ধরে। বর্তমানে ঈদের দিনগুলোতে এক ধরনের নতুন প্রথা লক্ষ্য করা যায়- ছোটরা বড়দের প্রতি 'ঈদী' নামের বখশিশের জন্য বায়না ধরে। তা যেন ঈদের সালামের বিনিময়-মূল্য। ছোটদের মধ্যে অন্য কোন দিকে তেমন আগ্রহ দেখা যায় না। তবে দৃষ্টি থাকে সালামের পর বড়জন পকেটে হাত দিচ্ছেন কিনা। অন্যথায়, বিরূপ প্রতিক্রিয়া। ঈদ উদ্‌যাপনের ক্ষেত্রে এটা এক নতুন ব্যাধি। ভাব-ভঙ্গিমার কিংবা দাবী করে 'ঈদী' আদায় করার এ কু-প্রথার অবসান হওয়া দরকার।

মাহে শাওয়ালের 'ছয় রোযা'র গুরুত্বও কম নয়। এ ছয়টি রোযা, পবিত্র কোরআন- হাদীসের ঘোষণানুসারে একজন রমযানের রোযাদারকে গোটা বছর, তথা গোটা জীবনব্যাপী রোযাদারের সাওয়াবের ভাগী করছে। রমযানের রোযাও ঈদের খুশীর আমেজ শেষ হতে না হতেই মুসলিম সমাজে অন্যতম বুনিয়াদ হজ্ব পালনের জন্য প্রস্তুতির। হজ্বের মাস পবিত্র শাওয়াল থেকেই শুরু হয়। সুতরাং যাদের উপর হজ্ব ফরয হয়েছে তারাও যদি যথাসময়ে হজ্ব করে নেয়, তবে তাও তার জন্য মহা সৌভাগ্যের বিষয় হয়। কারণ, সামর্থ্যবান লোকের উপর হজ্ব ফরয। হজ্ব ফরয হবার বিষয়টিকে অস্বীকার করলে মানুষ ঈমানহারা হয়ে যায়। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কেউ হজ্ব পালন না করলে সে ইহুদি কিংবা খ্রিস্টান হয়ে মৃত্যুবরণ করার আশংকা থাকে। [আল হাদিস]

আর কেউ যথাযথভাবে হজ্ব পালন করতে পারলে সে নবজাত শিশুর ন্যায় নিস্পাপ হয়ে ফিরে আসতে পারে। অগণিত সাওয়াবে সমৃদ্ধ হয় তার আমলনামা।

তাই, আসুন আমরা মাহে রমযানের মত এ মাসকেও যথাযথভাবে মূল্যায়ন করি। এখন থেকে পরিশুদ্ধ এ নিষ্কলুষ জীবন যাপনে সচেষ্ট হই।

www.sunnibarta.com

ঈদ হোক মুসলিম উম্মাহ্ 'র জাগরণের প্রতীক

আবু নাছের মুহাম্মদ তৈয়ব আলী

মুসলিম উম্মাহ্'র দ্বারে সমাগত পবিত্র ঈদ। শাওয়ালের চাঁদ উঠার সাথে সাথে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার হৃদয়-মনে এক অপূর্ব আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। ছোট্ট শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত যে কোন বয়েসী নারী পুরুষের মনে ক্ষণিকের জন্য হলেও আনন্দের ঝিলিক দেখা দেয়। আমাদের জাতীয় কবির অমর সৃষ্টি কবিতার ছত্র প্রত্যেকের মুখে মুখে ফেরে-

ও মন রমজানের ওই রোযার শেষে এলো খুশীর ঈদ
তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে শোন আসমানী তাকীদ।

এ ঈদ কি শুধু ক্ষণিকের তরে আনন্দ দিতে আসে? ক্ষণিকের আনন্দ লাভের মধ্যেই কি ঈদের সার্থকতা? কখনো নয়। প্রকৃত পক্ষে পবিত্র ঈদের প্রাক্কালে মুসলিম উম্মাহ্র উচিত আত্ম সমালোচনা করা। মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার মাধ্যমে অর্জিত প্রশিক্ষণ তথা এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের মাধ্যমে নবজাগরণের সূচনা করা। গোটা রমজান মাসে মুসলামানরা কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে মসজিদে মসজিদে নামায আদায় করেছে একই সময়ে, ইফতার করেছে একই সময়ে। পবিত্র ঈদ উৎসবে শামিল হয়েছে একই সময়ে। একে অপরের সাথে ছোট-বড় ধনী-গরীব, দোস্ত- দুশমন সবাই মিলেমিশে একাকার হয়ে সমস্ত ভেদা-ভেদ, মনোমালিন্য, হিংসা-বিদ্বেস ভুলে গিয়ে পরমাত্মীয়ের মতো কোলাকুলি করে থাকে। এতে সৃষ্টি হয় মহামিলনের এক অপূর্ব আনন্দঘন মুহূর্ত। সকলের মাঝে জন্ম নেয় সৌহার্দ-সম্প্রীতি। প্রত্যেক পরিবারের প্রত্যেক সমাজের তথা গোটা রাষ্ট্রের প্রতিটি সদস্যের মাঝে রচিত হওয়া লৌকিকতামুক্ত সৌহার্দ-সম্প্রীতি ও একতার মেলবন্ধনকে যদি স্থায়ী রাখা যায় তবেই হবে ঈদের স্বার্থকতা। মূলত ঈদের মাধ্যমে সৃষ্ট প্রীতির এ অটুট বন্ধন স্থায়ী রেখে মুসলিম উম্মাহ্ ঐক্যের মাধ্যমে আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উদ্যোগ নিলেই হবে ঈদের এ মহামিলনের স্বার্থকতা। বিশ্বের অধিকাংশ লোকই মুসলিম। অথচ বিশ্ব মুসলিমের বর্তমান বড় করুণ দশা। আজ সময় এসেছে এ অবস্থা হতে উত্তরণের। তবে এ করুণ অবস্থা হতে উত্তরণের উপায় কী? একমাত্র উপায় বিশ্ব মুসলমানদের ঐক্য। আমাদের দেশের প্ররিপ্রেক্ষিতে আলোচনায় আসা যাক। সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমানদের দেশ বাংলাদেশ। সংখ্যা গরিষ্ঠের অবস্থা ও মতামতের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে থাকে। অর্থাৎ সংখ্যা গরিষ্ঠরা যা চায় তা-ই করতে পারে। সংখ্যা গরিষ্ঠ দিকে তাকালে আমরা দেখি দারিদ্রতা, শিক্ষার অনগ্রসরতা শরীয়তের বিধি-বিধানের যথোপযুক্ত মনোযোগ ও অনৈক্য। এ দেশের অধিকাংশ মুসলমান দারিদ্রসীমার নিচে বাস করছে, ফলে অশিক্ষা ও অনগ্রসরতা তাদের নিত্যসঙ্গী।

দারিদ্র্য, যাকাত ও সুদপ্রথা

বর্তমান সমাজের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে স্থান করে নিয়েছে অভিশপ্ত সুদপ্রথা। অমুসলিমদের সম্মিলিত সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এনজিওদের সাহায্যের নামে এদেশের মুসলমানদের ঘরে-ঘরে ছড়িয়ে দিয়েছে সুদপ্রথা। অভিসপ্ত এ সুদি লেন-দেন ধ্যান-ধারণা অত্যন্ত সুকৌশলে আজ বিস্তার লাভ করেছে দারিদ্র্যতার সুযোগে। মুসলমানদের দারিদ্রতা ও অভাবের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এনজিও সংস্থাগুলো সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে চড়া হারে সুদ আদায় করছে। এ চক্রবৃদ্ধির সুদের করাল গ্রাসে নিষ্পেষিত ও নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে দরিদ্র মুসলমানরা। দেখা গেছে অভাবের তাড়নায় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ নেয়ার পর ঐ ঋণের চড়াসুদ দিতে গিয়ে অসহায় লোকগুলো আরো একটি বড় অংকের ঋণ নিতে বাধ্য হচ্ছে। এনজিওগুলো আবার এ ক্ষেত্রে (চড়া সুদে ঋণ দিতে) বেশ উদার। অর্থাৎ ৫ হাজার টাকার সুদের আসলে আট হাজার টাকা আদায় করে আরো দশ হাজার টাকা ঋণ দিতে তারা প্রস্তুত। এভাবে একটি ঋণের বোঝা লাঘবের আশায় আরেকটি ঋণের দিকে হাত বাড়িয়ে ফলে ঋণ পরশোধে ব্যর্থ হয়ে দিনে দিনে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে। বর্তমানে এনজিওদের দেখা-দেখি সমবায় সমিতি, সঞ্চয়ী সমিতি কিংবা কো-অপারেটিভ ব্যাংকিং নামে সমাজের এ সুদি লেন-দেন ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। সুদ সম্পূর্ণ হারাম

www.sunnidhara.com

ও জঘন্য গুনাহ। অথচ দেখা যাচ্ছে একজন মুসলমান নামায পড়ছে, রোযা রাখছে, ধর্ম-কর্ম করছে, আবার সুদি কাজ-কারবারও করছে অবাধে। নিজেরদের গড়া সমবায় সমিতি, কো-অপারেটিভ, সঞ্চয়ী ঋণদান সংস্থার মাধ্যমে চড়া সুদে ঋণ দিচ্ছে নিচ্ছে। এভাবে সুদি ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ছে অবলীলাক্রমে।

প্রকৃত মুসলমানরা আল্লাহ্ -রসূল কর্তৃক হারামকৃত সুদী কারবারে জড়িয়ে জঘন্য গুনাহ ও অপরাধে লিপ্ত হবে, কস্মিনকালেও এমন হওয়ার কথা নয়। যেহেতু মুসলমানদের হাতে রয়েছে দারিদ্র্য নির্মূলের শক্তিশালী অস্ত্র যাকাত। যাকাতের মাধ্যমে সমাজের অভাবী মুসলমানদের অভাব মোচন করে প্রকৃত স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলার জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা যাকাতের মতো সুন্দর পন্থা প্রদান করেছেন। প্রতিবছর ধনাঢ্য মুসলমানরাই তো যাকাত আদায় করছে, তবুও কেন মুসলমানদের পিছু ছাড়ছে না অভাব, দারিদ্রতা নিত্য তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। গভীরভাবে এ কথা চিন্তা করতে হবে মুসলমানগণ। তাদের গলদ কোথায়? আসলে অভাবী মুসলমানগণ তাদের পাওনা (যাকাত) যথাযথভাবে পাচ্ছে না, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসেব নিকেশ করে যথাযথভাবে যাকাত আদায় না করে সম্পদশালীরা লোকদেখানো পন্থায় যাকাত দিচ্ছে, আল্লাহ্র কঠিন আযাবের ভয় করছে না। অথচ, দরিদ্রদের অধিকার ও প্রাপ্য এ যাকাত প্রদান কার্যক্রম সুপরিকল্পিত পন্থায় দারিদ্রতা বিমোচনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় আদায় হওয়া উচিত। নিজেদের উপর অর্পিত ফরজ আদায়ের জন্য তাদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে চুপি চুপি যাকাত দিয়ে আসা উচিত। ধনীদের মধ্যে অনেকেই জানার জন্য চেষ্টাও করেনা যে, যাকাত কিভাবে দিতে হয়, সম্পদের কত ভাগ যাকাত দিতে হয় এবং যাকাতের হিসাব কীভাবে করতে হয়? ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম এ যাকাত আদায়ে সামান্যতম ব্যতিক্রম হলে পরকালে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতে হবে তা কখনো ভুলে যাওয়ার নয়। অভাবী মুসলমানরা যদি যাকাতের খাত থেকে উপযুক্ত সাহায্য-সহায়তা পেত, তা হলে সুদের দিকে কখনো হাত বাড়াত না। মুসলমানদের মঙ্গলের জন্যই প্রবর্তিত সুন্দর ব্যবস্থা 'যাকাত'। অনেক গরীব মুসলমান প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকার পরও পুঁজির অভাবে ব্যবসা করতে না পারায় স্বাবলম্বী হতে পাছে না। এমন অসহায় লোকগুলো যদি যাকাত ফান্ড হতে যথোপযুক্ত সহায়তা পেতো, তাহলে ধীরে ধীরে স্বাবলম্বী হতে পারত। এই যে প্রচলিত যাকাত আদায়ের পন্থার ভুল ও অসমন্বিত ব্যবস্থাপনা যদি তা দূর করে সঠিক সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, তাহলে তথাকথিক দারিদ্র মানুষের বন্ধুরূপী শত্রু এনজিওগুলো সুদের মত হারাম প্রথার বেড়াজালে আমাদের কে আটকাতে সক্ষম হতো না। কথা হচ্ছে হারামের এ অবাধ প্রচলন বন্ধে কে পদক্ষেপ নেবে? এ দায়িত্ব কার উপর বর্তায়? কে দেবে সঠিক দিক-নির্দেশনা। নিশ্চয় এ দায়িত্ব সর্বাগ্রে সমাজের মহাসম্মানিত আলিম সমাজের। তাদের উচিত 'সুদ হারাম' এ ঘোষণা প্রচারের সাথে সাথে অভাবের তাড়নায় সাহায্য যাতে অবারিতভাবে পায় সে দিকে অবশ্যকীয় নির্দেশনা দেয়।

এ বারের ঈদ হোক মুসলিম উম্মাহ্র দারিদ্রতা নির্মূলের তথা অভিশপ্ত প্রথা। হারামকৃত সূদপ্রথা নিমূলের শপথ গ্রহণের। তবেই হবে ঈদ উৎসবের যথার্থতা। যেহেতু মুসলিম সমাজ ঈদ পূর্ব মাসব্যাপী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জন করেছে মহামূল্যবান তাক্বওয়া-পরহেযগারী বা খোদাভীতি। যার অন্তর খোদাভীতিতে সন্ত্রস্ত এবং রসূলপ্রেমে সজীব, সে কখনো স্বীয় দায়িত্ব পালনে অবহেলা করতে পারে না, জীবন চলার পথে অন্যায় ও দুর্নীতির পথে পা বাড়াতে পারে না। কারণ, তার সবকিছুতেই উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধুমাত্র আল্লাহ্ ও রসূলকে সন্তুষ্ট রাখা এবং পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করা। এ খোদাভীতি ও রসূলপ্রেমের শূন্যতার কারণেই অনাচার, দূরাচার, অবিচার, অশান্তি ও অতিষ্ট সমাজ ক্রমশ কলুষিত। মুসলমানরা আজ ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। এখনো মুসলমানগণ ইসলামবিদ্বেষ ও নবী অবমাননার বিরুদ্ধে সমূজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখতে পারে। এবারের ঈদ হোক মুসলিম উম্মাহ্র জাগরণের প্রতীক।

www.sunnibarta.com

কোরআনই বিজ্ঞানের প্রধান উৎস

মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার

ইসলামের সত্যাসত্য বিবেচনার জন্য কুরআন যে আল্লাহ্‌র বাণী তা প্রমাণিত হওয়া অপরিহার্য। আর, কুরআন যে আল্লাহ্‌র বাণী তা বোধগম্য হবার জন্য দরকার এর সার্বিক বাস্তবতা। বিশেষত আধুনিক শিক্ষিত এবং বিজ্ঞান মনস্কদের কাজে কুরআন-সুন্নাহ্‌'র অপরিহার্যতা বিবেচনায় আনতে হলে এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও সময়ের দাবি রাখে। কুরআনের আয়াতগুলো যে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা তুলে ধরা সম্ভব হলে ইসলামের আশ্রয়ে অন্যান্য ধর্মের শিক্ষিত লোকেরাও ছুটে আসবে দলে দলে। জ্যামিতিকহারে বিজ্ঞানের অগ্রগতি দিন দিন সে সুবর্ণ সময়েরই হাতছানি দিচ্ছে। সাথে সাথে কুরআনের গবেষক এবং ইসলামি চিন্তাবিদদের শরীরেও সে পরিবর্তনের হাওয়া লাগতে হবে। কারণ, স্বয়ং রাব্বুল আলামীনই তাঁর কালামে পাকে সে ইঙ্গিত দিয়েছেন বার বার। কুরআনে করীমের বিভিন্ন আয়াতে সৃষ্টি রহস্য বর্ণনার সাথে সাথে এও বলা হয়েছে যে, এতে চিন্তাশীল ব্যক্তি তথা উ-লিল আরবাব'দের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে। তবে, এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি দায়িত্বশীল পদক্ষেপ নেওয়া উচিত মুসলিম বিশ্বের সরকারগুলোর। কারণ, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া কুরআন ও বিজ্ঞান গবেষণায় সমন্বয় সাধন সহজ হবে না। এমন পৃষ্ঠপোষকতার সুযোগ সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত অন্তত কুরআনের গবেষকদের উচিত বিজ্ঞানের এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত বিষয়গুলোর সাথে কুরআনের বক্তব্যের মিলগুলো খুঁজে বের করা যেহেতু পাশ্চাত্য পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠা বিজ্ঞানীদের গরজ নেই কুরআনের খবর নেওয়ার, সেহেতু এই পক্ষ থেকেই অগ্রসর হতে হবে। যদিওবা কুরআনের দেওয়া তথ্যগুলো বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে আরো বেশি সহজ ও ত্বরান্বিত করতো বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। গবেষকরা এ পর্যন্ত কুরআনের প্রায় আট শো (৮০০) আয়াত চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন যা বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে এ ধরণের আয়াতের সংখ্যাও বাড়তে থাকবে সমান্তরালে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির কারণে কুরআনের অনেকগুলো আয়াতের ব্যাখ্যা বা তাফসীর হবে আরো সমৃদ্ধ এবং নতুন দিক-নির্দেশনামূলক। যেমন, অতি সাম্প্রতিককালে আবিষ্কৃত হয়েছে (Big Bang Theory) বা মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব। এ তত্ত্বের মূল কথা হলো, এ নভোমন্ডলের সবকিছু শুরুতে একত্রিত অবস্থায় ছিল। এক মহাবিস্ফোরণ এদের পৃথক পৃথক বা টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। আর এ তথ্য আবিস্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন দুইজন বিজ্ঞানী। অথচ, কুরআনের আয়াতের সাথে মিলিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এটা কোন নতুন আবিস্কার নয়, বরং কুরআনের একটি বিশিষ্ট আয়াতের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ মাত্র। উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, কাফেররা কি ভেবে দেখে না যে, নভোমন্ডল ও পৃথিবী আদি অবস্থায় পরস্পর সংযুক্ত ছিল, তারপর আমি (একটি মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে) তাদেরকে টুকরো টুকরো করে পৃথক করে দিয়েছি। আমি সব জীবন্ত পদার্থই পানি হতে সৃষ্টি করেছি। তারপরও কাফেররা অবিশ্বাস করবে? (আল কুরআন ২০:৩০)

উক্ত আয়াতের সাথে - Big Bang Theory তে কোন অমিল নেই। পার্থক্য হলো, আয়াতের বিষয়টি দেড় হাজার বছর পূর্বে নাজিল হয়েছে, আর Big Bang Theory তা এতোদিন পরে প্রমাণ করেছে মাত্র। শুধু তাই নয়, আয়াতের অপর অংশে বলা হয়েছে যে, 'তারপরও কাফেররা অবিশ্বাস করবে? হ্যা, তাও ঠিক। কারণ, যে দু'জন বিজ্ঞানী এ তত্ত্বের আবিস্কারক তারা অবিশ্বাসীই রয়ে গেছে। তাছাড়া আয়াতে উক্ত সব জীবন্ত পদার্থই পানি হতে সৃষ্টি করেছি, অংশটিও আজ বিজ্ঞান গবেষনায় প্রমাণিত। আমরা জানি, জীবকোষের মৌলিক

www.sunnibarta.com

অংশ সইটোপ্লাজম পানি দ্বারাই গঠিত, আর এ জন্যই জীবনের সাথে পানির যোগসূত্র অবিচ্ছেদ্য। বর্তমানে একই কারণেই মহাশূন্যে জীবের অস্থিত্ব সন্ধানের প্রয়োজনে পানির সন্ধান করা হচ্ছে প্রথমেই। যা উক্ত আয়াতাংশের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছু নয়।

কুরআনের অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে, 'আমি প্রত্যেক বস্তু জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। (আল কুরআন- ৫১ : ৪৯)

একই ধরণের অপর আয়াত হলো, 'পবিত্র তিনি, যিনি জমিন হতে উৎপন্ন করেছেন উদ্ভিদকে, তাদেরই মানুষকে এবং যা তারা জানে না, তার প্রত্যেককে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন। (৩৬ : ৩৬) ওই আয়াতে তিনটি শ্রেণীর কথা উল্লিখিত যা জোড়ায় জোড়ায় অর্থাৎ বিপরীতধর্মী সম্পূরক জুটির সমন্বয়ে সৃষ্টি। একটি হলো, মানুষ বা অন্যান্য প্রানীকুল. দ্বিতীয়টি উদ্ভিদ এবং তৃতীয়টি অজ্ঞাত শ্রেণী। এখানে মানুষ বা জীব জন্তুর জোড়া তথা পুরুষ-স্ত্রীলিঙ্গ সম্পর্কে মানুষ সেই হাজার হাজার বছর থেকেই অবগত বটে, কিন্তু উদ্ভিদের জোড়া সম্পর্কে আবিষ্কার হয়েছে পরবর্তীকালে। কিন্তু 'যা তারা জানে না' অংশের তাফসীর ও আজ আর অজ্ঞাত নয়, বিজ্ঞানের কল্যাণে। কারণ, বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, শুধু প্রাণী ও উদ্ভিদের নয়, বরং পদার্থ মাত্রই জোড়ায় জোড়ায় গঠিত। কারণ এক সময় মানুষ শুধু অনু-পরমানু সম্পর্কে জানতো মাত্র। কিন্তু এখন বিজ্ঞান পরমাণু (Atom) কেও আরো ক্ষুদ্রতর অংশে ভেঙ্গে ফেলেছে এবং আবিস্কার করেছে, ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন। প্রমানিত হয়েছে প্রত্যেক পদার্থই বিপরীতধর্মী ইলেকট্রন প্রোটনে গঠিত। চুম্বকীয় শক্তি তথা আকর্ষণ বিকর্ষণ ও সে সভ্যতার সাক্ষী হয়ে আছে। শুধু তাই নয়, অপর আয়াতে বলা হয়েছে, "তিনি নভোমন্ডল ও পৃথিবীতে জাররাহ এবং তার চেয়ে ক্ষুদ্রতর বস্তু সম্পর্কে সম্যক অবগত" (কুরআন ৩৪ :৩) যা ওই আয়াতে একই সাথে প্রমাণিত হয়েছে। কারণ, কুরআন নাজিলের সময়ের হাজার বছর পূর্বে মানুষ শুধু জাররাহ সম্পর্কেই জানতো। তখন জাররাহ শব্দ দ্বারা পদার্থের ক্ষুদ্রতর বস্তু (Atom) বা পরমাণুকেই বুঝাতো। কিন্তু, আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতে ঘোষণা দিলেন যে, এর চেয়েও ক্ষুদ্রতম কণিকা রয়েছে যা তিনি (আল্লাহ্) ভালো জানেন। আজ ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রনের আবিস্কার তা প্রামণ করে দিল।

বিজ্ঞানের অন্যতম আবিস্কার চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবীর আবর্তন, ঘুর্ণয়ন সব কিছুইতো কুরআনের নতুন ব্যাখ্যার সন্ধান দিয়েছে এবং প্রমাণ করেছে যে, কুরআন বিজ্ঞানেরই প্রধান উৎস। কী সুন্দর বলা হলো যে, "তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। সবাই আপন কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে। (২১ : ৩৩)

এভাবে একের পর এক আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা এবং আধুনিক বিজ্ঞানের আবিস্কারগুলোর সমন্বয় করলে সহজেই প্রমাণিত হবে যে, কুরআন কোন মানুষের রচনা নয়, বরং আল্লাহ্রই ওহী! কারণ, যে সময়ে এ মহাগ্রন্থ নাজিল হয়েছিল তখন এ সব বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের অস্তিত্ব কল্পনাও করা যেত না। সৃষ্টির রহস্যাবলী স্রষ্টাই ভালো জানেন এবং তা তাঁর ওহীর মাধ্যমে ইশারা ইঙ্গিতে কিংবা সরাসরি প্রকাশ করেছেন যা হৃদয়ঙ্গম করতে কিংবা পরিস্কারভাবে বুঝে ওঠতে দরকার বৈজ্ঞানিক আবিস্কার। এ ধরণের আবিস্কারের পূর্বে যেমন উক্ত আয়াতগুলোর তর্জন ব্যাখ্যা সবকিছুই দুর্বোধ্য অস্পষ্ট ছিলো, ঠিক তেমনি কুরআনের অসংখ্য আয়াত এখনো অনুরূপ দুর্বোধ্য রয়ে গেছে যা বিজ্ঞানের পরবর্তী উদ্ভাবনের অপেক্ষায় রয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছিল, "তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক কি করেছিলেন- আ'দ বংশের ইরাম গোত্রের প্রতি; যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রসাদের যার সমতুল্য কোন দেশে নির্মিত হয়নি। (আলা কুরআন – ৮৯ : ৬-৮)

উল্লিখিত আয়াতের ইরাম শহর বা গোত্রের কাহিনী কোন রূপকথা যে নয়, বরং হাজার হাজার বছর আগের ধ্বংসের ইতিহাস তাও আজ দিবালোকের মতো পরিস্কার মনে হচ্ছে। ১৯৭৮ সনে প্রকাশিত ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

www.sunnibarta.com

জার্নাল সুত্রে পাওয়া যায় যে, ১৯৭৩ সালে সিরিয়ার ৪৩০০ বছরের প্রাচীন এক শহর 'এবালা' খনন করে আবিস্কৃত হয় যাতে একটি লাইব্রেরীরও সন্ধান পাওয়া যায়। আর, এই লাইব্রেরীর একটি রেকর্ড বই এ পাওয়া গেছে সে শহরের সাথে অন্যান্য যে সব শহরের ব্যবসায়িক যোগাযোগ রয়েছে সে সব তথ্য। এখানে 'ইরাম' নামক শহরের নাম পাওয়ার পর কুরআনের উল্লিখিত কাহিনী যথার্থতা ফুটে ওঠেছে সাড়ে চার হাজার বছর পর। এভাবে এ পর্যন্ত আবিস্কৃত বৈজ্ঞানিক তথ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কুরআনের আয়াতগুলোর বর্ণনায় ভূগোল, ইতিহাস থেকে শুরু করে আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, পরিবেশ বিজ্ঞান সব কিছুর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রেখে বিস্ময়াভিভূত হয়- যা এ ক্ষুদ্র পরিসরে বর্ণনাতীত। শুধু, কুরআন শরীফ কেন? হাদীস শরীফের কিছু উপাদানও আজ দিনের আলোর মত স্পষ্ট। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম শেষ জামানায় যা যা ঘটবে বলে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন তা ইতোমধ্যে ঘটতে শুরু করেছে। তিনি শেষ জামানায় মুসলমানদের মধ্যে ৭৩ দলের বিভক্তির যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন তা আরো অনেক আগেই ঘটে গেছে।

হযরত বড়পীর গাউসুল আজম আবদুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি সে ৭৩ দলের তালিকা ও প্রকাশ করেছিলেন তার 'গুনিয়াতুত তালেবীন' নামক গ্রন্থে। হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, নজদ থেকে শয়তানের শিং বের হবে, সেটাও আজ বাস্তবায়িত হলো নজদ'র সে কলংকিত নামকে পরিবর্তন করে রিয়াদ নাম দিয়ে এবং একে রাজধানী ঘোষণা করে ১৯৩২ এর ২৩ সেপ্টেম্বর বৃটিশ আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতায় সাউদী আরব রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। শুধু নবীজি'র ভবিষ্যৎবাণী নয়, হযরত গাউসুল আ'জম আবদুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র ভবিষ্যৎবাণীও আজ বাস্তবায়িত হয়েছে। তিনি লিখেছিলেন যে, শিয়াদের একটি জঘন্য ফেরকার উদ্ভব হবে ইরানের খোম অঞ্চল থেকে। আয়াতুল্লাহ খোমেনীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত নতুন শিয়া রাষ্ট্র ইরান সে নিদর্শন বহন করছে। গাউসে জামান তৈয়্যব শাহ্ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র একটি চিঠি এখনো সংরক্ষিত আছে- যাতে তিনি লিখেছিলেন যে, 'খুব শিগগিরই সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হবে এবং মুসলিম দেশগুলো বেরিয়ে আসবে। আজ সে ভবিষ্যৎবাণীও সত্যে পরিণত হলো। আর এসব সত্যই হলো ইসলামের সত্যতার অন্যতম নিদর্শন। এর কোনটাই বিজ্ঞানের বাইরে নয়। কারণ, বিজ্ঞানের দাবি হলো তত্ত্ব ও ব্যবহারিক এক হওয়া। দুইয়ে দুইয়ে চার হওয়া। 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' এর ১৯ হরফ দিয়ে কুরআনের মোট সূরা, হরফ, শব্দ, আল্লাহ্ শব্দ. বিসমিল্লাহ শব্দ ইত্যাদিকে নিঃশেষে বিভাজ্য করতে পারার বিস্ময়কর আবিস্কার প্রমাণ করে এক অবিকৃত ওহী হবার যথার্থতা। তাই, আজ কুরআন-সুন্নাহকে পরিবর্তনশীল যুগের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ও আলোচনায় নিয়ে আসা জরুরি যাতে ইসলামের প্রগতিশীলতার সামনে ষড়যন্ত্র কারীদের প্রতিক্রিয়াশীল অপবাদ আদর্শিকভাবেই ধরাশয়ী হয়ে যায়। 'সত্য সমগত- মিথ্যা অপসৃত- মিথ্যার বিনাশ হবেই (আল কুরআন) ইনশা আল্লাহ।

www.sunnibarta.com

সাদক্বাতুল ফিত্‌র, ঈদুল ফিতর এবং পরবর্তী নফল ইবাদত

সুন্নী গবেষণা কেন্দ্র

সাদক্বাতুল ফিত্‌র

সাদাকাতুল ফিতর অর্থ- রোযা সমাপ্তিতে ফকির মিসকিনকে সাদ্‌কা দান করা। এতে রোযার ত্রুটি-বিচ্যুতির ক্ষতিপূরণ হয় এবং গরীব মুসলমানকে ঈদ করতে সহায়তা করা হয়। এটি ওয়াজিব। রোযাদার বে-রোযাদার প্রত্যেক সামর্থবান ছাহেবে নেছাব ব্যক্তি তার অধীনস্থ ছেলে-মেয়ে স্ত্রী ও নির্ভরশীল ব্যক্তিদের পক্ষ হতে এবং গোলাম বাঁদীদের পক্ষ হতে মাথাপিছু ২ কেজি ৫০ গ্রাম গম/আটা অথবা ৪ কেজি ১০০ গ্রাম কিসমিস খেজুর বা তার মূল্য আদায় করবে। ঈদের নামাযের পূর্বে আদায় করা উত্তম। অথবা হিসাব করে পৃথক করে রেখে হক্বদারদের নিকট পরে পাঠিয়ে দিতে হবে। হাদীস শরীফে অর্ধ-ছা গম আটা অথবা এক ছা খেজুর কিমমিস দেয়ার আদেশ এসেছে। তাই ধনী সামর্থবানরা খেজুর, কিসমিস দিয়ে ফিতরা আদায় করলে গরীবরা গম বা আটার মূল্য দিয়ে আদায় করলেও আদায় হয়ে যাবে। হক্বদারদের মধ্যে সুন্নী আক্বিদা হওয়া শর্ত। বাতিল আকিদাপন্থী কোন ব্যক্তিকে বা কোন বাতিল প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছাত্রীদেরকে ফিতরা যাকাত দিলে ওয়াজিব আদায় হবেনা। (ফতোয়া আলমগীরী, বাহারে শরিয়ত ফতোয়া রিজভিয়া প্রভৃতি) তবে অন্যভাবে সাহায্য করা যাবে।

সাদক্বাতুল ফিতর-এর ফযিলত

عَنِ ابْنُ عَبَّاسٍ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ»

“আবু দাউদ ও নাছায়ী বর্ণনা করেছেন - নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাদকাতুল ফিতরকে বাধ্যতামূল করে দিয়েছেন। এর পরিমান হলো মাথা পিছু এক ছা‘ খেজুর বা যব অথবা অর্ধ ছা‘ গম বা আটা। এটি প্রত্যেক স্বাধীন, ক্রীতদাস, পুরুষ, মহিলা, ছোট, বড় সকলের উপর ওয়াজিব”। (আবু দাউদ, ইবনে আব্বাস (রাঃ) সূত্রে)

عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»

অর্থঃ হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাদ্‌কাতুল ফিতরকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন এক ছা‘ খেজুর অথবা যব। আজাদ, গোলাম, পুরুষ, নারী, ছোট-বড় সকল মুসলমানের উপর এবং ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বেই তা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)।

রোযা, তারাবিহ, ই’তিকাফ, শবে ক্বদর ও ফিতর- এগুলো হাদীস মোতাবেক আমল করার জন্য আল্লাহ্‌ তৌফিক দান করুন

বিঃদ্রঃ- খেজুর, কিসমিস, আটা, গম বা তার মূল্য ছাড়া অন্য কোন খাদ্য দ্রব্য দিলে ফিতরা আদায় হবে না। যেমন- চাউল।

ঈদুল ফিতরের ফযিলত

১। প্রত্যেক জাতির আনন্দের দিন রয়েছে। মুসলমানদের আনন্দের দিন ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা।

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا.

অর্থ ঃ নবী করিম সাল্লল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন প্রত্যেক জাতিরই আনন্দ দিবস রয়েছে। আর এই দিনটি হলো আমাদের ঈদ। (বুখারী ও মুসলিম)

www.sunnibarta.com

২। ঈদুল ফিতরের দিনটি পুরস্কার দিবস ঃ-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على ابواب الطرق فنادوا اغدوا يا معاشر المسلمين الى رب كريم .يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل – لقد امرتم بقيام الليل فقمتم وامرتم بصيام النهار فصمتم واطعمتم ربكم فاقبضوا جوائزكم فاذا صلوا نادى مناد الا ان ربكم قد غفرلكم . فارجعوا راشدين الى رحالكم. فهو يوم الجائزة ويسمى ذلك اليوم فى السماء يوم جائزة رواه الطبرانى -

অর্থ ঃ রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন ঈদুল ফিতরের দিন আসে- তখন ফেরেস্তারা রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিতে থাকেন- হে মুসলমান সম্প্রদায়, তোমরা মহান দাতা আল্লাহ্ তায়ালার নিকট অতি শীঘ্র চলো; যিনি নেক কাজের তৌফিক দাতা এবং অধিক সাওয়াব দাতা। তোমাদেরকে রাত্রে ইবাদতের আদেশ করা হয়েছে - তোমরা তা পালন করেছো, দিনের বেলায় রোজা রাখার আদেশ করা হয়েছে, তোমরা তা রেখেছো এবং তোমাদের পালনকর্তাকে (তাঁর মিসকিনকে) খানা দিয়েছো; আজ তার পুরস্কার গ্রহণ করো। তারপর যখন ঈদের নামায পড়া শেষ হয় তখন ঘোষণাকারী একজন ফেরেস্তা ঘোষণা দিতে থাকেন- শুন, তোমাদের রব (পালনকর্তা) তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। সুতরাং এখন তোমরা পূণ্যময় দেহ-মন নিয়ে তোমাদের ঘরে প্রত্যাবর্তন করো। আজকের এই দিনটি হচ্ছে পুরস্কারের দিন। আকাশে এই দিনের নাম হচ্ছে উপহার দিবস (তাবরানী)।

৩। দুই ঈদের দিনে রোযা রাখা হারাম

عن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صوم فى يومين الفطر والاضحى. متفق عليه

অর্থ ঃ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দুই দিন রোযা রাখা জায়েয নেই। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা (বুখারী ও মুসলিম শরীফ) ৪। আইয়্যামে তাশরীক অর্থাৎ ১১, ১২ ও ১৩ জিলহজ্ব খাওয়া দাওয়ার দিন।

হযরত নুবাইশাতা হোযালী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তাশরীকের তিন দিন হলো খানাপিনা ও যিকির আযকারের দিন (মুসলিম)।

বিঃদ্রঃ- কোরবানীর ঈদের আগের দিনকে বলা হয় ইয়াওমে আরাফাহ। কোরবাণীর পর তিন দিনকে অর্থাৎ ১১, ১২ ও ১৩ তারিখকে পৃথকভাবে বলা হয় আইয়ামুত তাশরীক। ৪ ও ৫ নং হাদীসে বর্ণিত কোরবানীর দিন ও তারপর ৩ দিন রোযা রাখাকে হারাম করা হয়েছে। বৎসরে মোট ৫ দিন রোযা রাখা হারাম। ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা ও পরের তিন দিন। এই দিনগুলোতে মক্কা শরীফে ওমরাহ করাও নিষিদ্ধ।

শাওয়ালের ছয় রোযার ফযিলত

عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أنه حدثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، كان كصيام الدهر»

অর্থ ঃ হযরত আবু আইউব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখার পর পরবতী শাওয়াল মাসে ৬টি নফল রোযা রাখবে, সে যেন পুরা বৎসরই রোযা রাখলো (মুসলিম শরীফ)।

বিশ্লেষণ ঃ প্রতি নেক কাজে দশটি সাওয়াব। এ হিসাবে রমযানের রোযার সাওয়াবের হিসাব হবে ৩০ x ১০ = ৩০০ দিন। শাওয়ালের ৬টি রোযা রাখলে হয় ৬ x ১০ =৬০ দিন। সুতরাং, ছয় রোযা রাখলে মাট ৩৬০ দিনের রোযাদার বলে গণ্য হবে। চাঁদের হিসাবে ৩৫৪ দিনে এক বৎসর হয়। ছয় রোযা রাখলে হয় ৩৬০ দিন। এতে এক বৎসর হয়। এতে এক বৎসরের উপর আরও ৬ দিন বেশি হয়। উক্ত ছয়টি রোযা শাওয়াল মাসের মধ্যে এক সাথে অথবা ভেঙ্গেও রাখা যায়।

www.sunnibarta.com

ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর ৬টি; ১২ টি নয়

সুন্নী গবেষণা কেন্দ্র

আহলে হাদীস বা লা-মাযহাবী ফের্কারা বলে ঈদের নামযে ১২ টি তাকবীর। তারা বলে- ছয় তাকবীর নাকি হাদীসে নেই। তাদের কেউ কেউ একলক্ষ টাকা ঘোষণা করে হানাফী মাযহাবকে চ্যালেঞ্জ করেছে। তাদের মতে হানাফী মাযহাব ভুল (নাউযুবিল্লাহ)। এ যেন পুটিমাছে বোয়ালমাছ খাওয়ার মত। তারা বেদআতী ও ভ্রান্ত দল। কাদিয়ানীদের মতই ইসলামে ফেতনা সৃষ্টি করা তাদের উদ্দেশ্য। বৃটিশ সরকারের নিকট দরখাস্ত করে তারা ওহাবী নাম পাল্টিয়ে আহলে হাদীস নাম রাখে। আল্লামা আরশাদুল কাদেরী (রহঃ) রচিত "তাবলীগী জামাত" নামক গ্রন্থে বৃটিশ পাঞ্জাব সরকারের মাধ্যমে তারা ওহাবী নাম পাল্টায় বলে পূর্ণ দলীল প্রমাণ সহ ফটোকপি আছে। যাক-হানাফী মাযহাব মতে অতিরিক্ত ছয় তাকবীরই শুদ্ধ- লা মাযহাবীদের ১২ তাকবীর শুদ্ধ নয়। তার প্রামণ দেখুন -

১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন -

عن عبد الله بن مسعود يكبر فى العيدين تسع تكبيرات خمسافى الاولى واربعا فى الثانية- تكبيرة الافتتا ح وتكبيرتا الركوع منها فتكون الزوائدست تكبيرات فى كل ركعة ثلاث تكبيرات زوائد -

অর্থ ঃ "হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন- ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামাযে মোট ৯টি তাকবীর দিতে হবে। প্রথম রাকআতে তাকবীরে তাহরীমা ও রুকুর তাকবীর এবং তিনটি অতিরিক্ত তাকবীরসহ মোট ৫টি। আর দ্বিতীয় রাকআতে অতিরিক্ত ৩টি ও রুকুর ১টি সহ মোট ৪টি। এই ৯টির মধ্যে উভয় রাকআতে অতিরিক্ত তাকবীর হবে ৩+৩=৬টি। এই হলো সর্বমোট ৯টি। ইহাই অধিকাংশ ও জমহুর সাহাবায়ে কেরামের অভিমত (কাযীখান হাশিয়ায়ে আলমগীরী পৃঃ ১৮৪)।

২। আবু দাউদ শরীফে হযরত সায়ীদ ইবনে আছ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি হযরত আবু মুছা আশআরী (রাঃ) এবং হোযায়ফা (রাঃ) -কে জিজ্ঞেস করলাম -

عَنْ سَعِيدَ بْنَ الْعَاص، سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: «كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ»، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: صَدَقَ،

অর্থ ঃ "সায়ীদ ইবনে আছ (রাঃ) বলেন - আমি হযরত আবু মুছা (রাঃ) ও হযরত হোযায়ফা (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করেছি- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর নামাযে কিভাবে তাকবীর বলতেন? হযরত আবু মুছা (রাঃ) জবাব দিলেন - হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম জানাযার নামাযের ন্যায় (প্রতি রাকআতে) চার চার তাকবীর বলতেন। হযরত হোযায়ফা(রাঃ) আবু মুছা(রাঃ)কে সমর্থন করে বললেন- আবু মুছা সত্য বলেছেন" (আবু দাউদ ও মিশকাত, সালাতুল ঈদাঈন)।

মিশকাত শরীফের হাশিয়ায় এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে প্রত্যেক রাকআতে ৪ বার করে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকবীর বলতেন। প্রথম রাকআতে তাকবীরে তাহরীমা ও অতিরিক্ত ৩ তাকবীর সহ ৪ তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকআতে কেরাতের পর অতিরিক্ত তিন তাকবীর ও রুকুর তাকবীর সহ ৪ তাকবীর বলতেন প্রথম রুকুর তাকবীর এখানে ধরা হয়নি। ইহাই ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) তথা হানাফী মাযহাবের মত। সাহাবীদের মতামতই আমাদের মতামত। প্রথম রাকআতের ৫ তাকবীরের বিষয় কাযীখানের ১নং বর্ণনায় দেখুন।

১২ তাকবীরের হাদীসের ব্যাখ্যা

তিরমিযি, ইবনে মাজাহ ও দারেমী শরীফে রয়েছে-

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي العِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ القِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ القِرَاءَةِ.

www.sunnibarta.com

অর্থ ঃ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রথমে রাকআতে ক্বিরআতের পূর্বে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকআতে কিরআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর বলেছেন"। (তিরমিযি)

এই হাদীসে উভয় রাকআতের ক্বিরআতের পূর্বে ১২ তাকবীর উল্লেখ আছে। এই রেওয়ায়াতে শুধু كبر শব্দ আছে, যার অর্থ হবে-"নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একবার এভাবে ঈদের নামায পড়েছেন।

আর হানাফী মাযহাবের ২নং দলীলে বর্ণিত সায়ীদ ইবনে আছ (রাঃ)এর হাদীসে كان كبر শব্দ ব্যহৃত হয়েছে -যার অর্থ হলো নবীজি সব সময় তাকবীরে তাহরিমা ছাড়া ৪+৪ তাকবীরে ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর পড়তেন। সুতরাং হুযুরের সব সময়ের আমল (استمرار) এর উপরই আমল করতে হবে। তদুপরি হযরত আবু মুছা ও হযরত হোযায়ফা দুইজন জলিলূল ক্বদর সাহাবী প্রিয়নবীর বেছালের অনেক পরে এই হাদীস বয়ান করেছেন। তদুপরি আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ এর হাদীসে তাহরীমা সহ ৯ তাকবীর উল্লেখ আছে। বুঝা গেল- তাদের আমলও তাই ছিল। সে জন্য ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) তাদের মত গ্রহণ করেছেন।

মদিনার জিন্দেগীতে ১০ বৎসরের মধ্যে অনেক হুকুম একবার হয়ে পরবর্তীতে রহিত হয়ে যায় এবং অন্য হুকুম নাযিল হয়। উম্মতের জন্য সহজ ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে এরূপ হতো। ঈদের তাকবীরের বেলায়ও তদ্রুপ হয়েছে। প্রথমে একবার ১২ তাকবীরে ঈদের নামায পড়ে পরবর্তী সময়ে অতিরিক্ত ৬ তাকবীর সহ ৯ তাকবীরে সীমিত করা হয়েছে। তাই তিনজন সাহাবী অনুরূপ সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। শেষ মতই আইনতঃ গ্রহণযোগ্য। ১২ তাকবীরের হাদীসখানা সহীহ হলেও তা মানছুখ বা মারজুহ হয়ে গেছে। আবু মুছা আশআরী ও হোযায়ফা (রাঃ) - দুইজন সাহাবীর বর্ণনায় তাই বুঝা যায়। এভাবেই সকল সাহাবীগণের বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যা ও সমন্বয় করতে হবে।

উল্লেখ্য, লা মাযহাবী লোকেরা ১২ তাকবীরে ঈদের নামায পড়ে এবং হানাফীদেরকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলে ছয় তাকবীরের নাকি কোন প্রমাণই নেই। আমরা প্রমাণ পেশ করলাম। এবার তাদের জবাব দেবার পালা।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নারায়ে তাকবীর
নারায়ে রিসালাত

আল্লাহু আকবার
ইয়া রাসূলাল্লাহ (দ:)

খানকা-এ-জলিলিয়া

"মা নীড়" ১৩২/৩ আহমদবাগ, রোড নং-২, সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪
ফোন ঃ ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-০৯০৬৯৯৬

খানকা-এ-জলিলিয়ায় প্রতি ইংরেজী মাসের ২য় বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব হালকায়ে যিকির ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সকল পীরভাই, হুজুরের ভক্তবৃন্দ ও অনুসারী খানকায় উপস্থিত হয়ে এবাদত-বন্দেগী ও হুজুরের রূহানী ফয়েজ লাভ করে আখেরাতের অশেষ নেকী হাসিল করুন।

সালামান্তে

মোহাম্মদ আবদুর রব ও হুজুরের ভক্তবৃন্দ

www.sunnibarta.com

সদকায়ে জারিয়ার ফযিলত

অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী

মহান আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। পরকালের অনন্ত জীবনের সম্বল অর্জনের নিমিত্তে পৃথিবীতে আমরা কেউ স্থায়ী নই। সুন্দর পৃথিবীর মায়াজাল ছিন্ন করে সবাইকে যেতে হবে চির অন্ধকার কবরে। ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে তারাই সফলকাম ও সত্যিকারের বুদ্ধিমান, যারা দুনিয়াকে আখেরাতের শস্যক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যেমন হাদীসে এসেছে- 'একজন আনসারী সাহাবী প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, যারা মৃত্যুকে সর্বাধিক স্মরণ করে এবং এর জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করে তারাই সর্বাধিক জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান; তারাই দুনিয়ার সম্মান ও আখেরাতের জীবনের তুলনায় অত্যন্ত ছোট হলেও এ ক্ষুদ্র জীবনের শান্তি ও মুক্তি। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কবরে একজন মৃত মানুষকে মহা সাগরে পতিত অসহায় ব্যক্তির সাথে তুলনা করেছেন, যে সামান্য খড়কুটা আকঁড়ে ধরেও বাঁচার প্রাণপণ চেষ্টা করে। এ চরম অসহায়ত্বের মাঝে ঘোর অন্ধকার কবরে মানুষের একমাত্র সঙ্গী তার নেক আমল। বান্দার মৃত্যুর পর কোন নেক আমল করতে অক্ষম হলেও চলমান থাকবে সাদকায়ে জারিয়ার সাওয়াব।

নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন-

" إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به،أو ولد صالح يدعو له

অর্থ ঃ- 'যখন আদম সন্তান মারা যায় তখন তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি বিষয় ব্যতীত। ১. সদকায়ে জারিয়াহ, ২. এমন ইলম বা জ্ঞান যা দ্বারা মানব জাতি উপকৃত হয়, ৩. এমন সুসন্তান যে তার জন্য দো'আ করে। [মুসলিম শরীফ]

সদকায়ে জারিয়া কী

প্রবহমান সদকা তথা সদকায়ে জারিয়া হলো এমন সদকা যার ফলে বান্দাহ্র নেক আমলনামা মৃত্যুর পরও চলমান থাকে। আল্লাহ্র পথে এমন কিছু সদকাহ বা দান করা যার ফলাফল দ্রুত মিলে। যেমন কোন অনাহারীকে খাবার দান করা, যা দ্বারা সে একবার ক্ষুধা মেটাল। দাতা একবারই সাওয়াব পাবেন। পক্ষান্তরে এমন কিছু দান আছে ফলাফল বা সাওয়াব দীর্ঘস্থায়ী হয়। যেমন কোন অভাবীকে স্থায়ী আয়বর্ধক সম্পদ দান করা, যা দিয়ে আয় করে সে তার সাময়িক প্রয়োজন পূরণ করতে পারে এবং দীর্ঘ মেয়াদে এর দ্বারা অর্জিত সম্পদ দিয়ে প্রয়োজন পূরণের পাশাপাশি নিজেও যাকাত দিতে ও দান সদকা করতে পারে। যার সাওয়াব উক্ত দানকারীর আমলনামায় মৃত্যুর পরও পৌঁছে দেয়া হয়। তাছাড়া মসজিদ, রাস্তা, ঘাট, সাঁকো নির্মাণ করলে কিংবা জায়গা জমি ওয়াক্ফ করলে যতদিন পর্যন্ত তা কায়েম থাকবে ততদিন দাতার আমলনামায় সাওয়াব পৌঁছতে থাকবে। এভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদরাসা, মসজিদ, এতিমখানা, হাসপাতাল নির্মাণ করলে বা নির্মাণে বিভিন্নভাবে সাহায্য করলে, এসব প্রতিষ্ঠান যতদিন জারি থাকবে শিক্ষার্থীরা সুশিক্ষা অর্জন করবে, রোগাক্রান্তরা চিকিৎসা সেবা পাবে ততদিন ওই দাতার আমলনামায় সাওয়াব পৌঁছতে থাকবে। আর ওই জ্ঞান, যার দ্বারা মানব জাতি উপকৃত হয়, যতদিন জ্ঞানের চর্চা থাকবে কিংবা ঐ জ্ঞান দ্বারা আমলের সিলসিলা জারি থাকবে ততদিন ওই জ্ঞানদাতার আমলনামার সাওয়াব পৌঁছতে থাকবে।

সদকায়ে জারিয়ার গুরুত্ব

পবিত্র ক্বোরআনে আল্লাহ্ তা'আলা পরকালীন অনন্ত জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তার জন্য বান্দাহদেরকে দান-সদকার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন -

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

অর্থাৎ-যারা রাতে ও দিনে প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহ্র পথে স্বীয় সম্পদ ব্যয় করে, তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে তাদের প্রভুর নিকট। তাদের কোন ভয় নেই আর তারা চিন্তিতও হবে না। (সূরা বাক্বারা ঃ- ২৭৪)

অন্যত্র আল্লাহ্ এরশাদ করেন -

www.sunnibarta.com

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

অর্থ ঃ কে সে যে আল্লাহ্‌কে করযে হাসানা প্রদান করবে? তিনি তার জন্য তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেবেন। আর আল্লাহ্ সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন এবং তার দিকেই তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (সূরা বাক্বারা : আয়াত ২৪৫)

তাফসিরে ইবনে কাছিরে বর্ণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উক্ত আয়াত অবতীর্ণের পর হযরত আবু দাহদাহ্ আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, হে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ্ তা'আলা কি আমাদের নিকট করযে হাসানা চান? রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপনার হাত মোবারক প্রদর্শন করুন, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু দাহদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সামনে স্বীয় হাত মোবারক বের করে ধরলেন। তখন হযরত আবু দারদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমি আমার প্রভুকে বাগানটি "করযে হাসানা" দিলাম। বর্ণনাকরী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, তার বাগানে ছয়শতটি খেজুর গাছ ছিল।

অন্যত্র হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আবু তালহা ছিলেন আনসারী সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সম্পদশালী এবং তার নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয় সম্পদ 'বাইরোহা' নামক বাগানটি। এটি ছিল মসজিদে নববীর সামনে। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এতে প্রবেশ করতেন এবং পানি পান করতেন। যখনই আল ক্বোরআনের নিম্মোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হল-

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের পছন্দনীয় সম্পদ থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত পূর্ণ সাওয়াব অর্জন করতে পারবে না। (সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৯২)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

অর্থ ঃ যারা নিজেদের সহায় সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে, তাদের উপমা হল, একটি শস্য দানা যা সাতটি শিষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শিষে একশত শস্যদানা হয়, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময় ও জ্ঞানী। (৯ সূরা বাক্বারা ঃ ২৬১)

নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উম্মতদেরকে সদকায়ে জারিয়ার জন্য নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন। এ মর্মে তিনি এরশাদ করেন- হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজি এরশাদ করেন, মানুষ বলে আমার সম্পদ, আমার সম্পদ। আসলে সে ধরণের সম্পদই তার নিজের যা সে খেয়ে ফেলেছে, যা সে পরিধান করেছে। অতঃপর যা সে দান করেছে এবং মানুষকে সন্তুষ্ট করেছে, এতদ্ব্যতীত যে সম্পদ রয়েছে তাতো পড়ে থাকবে।" (মুসলিম শরীফ)

অন্যত্র নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- 'মানুষের বিচার ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ ক্বিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকেই তার সদকার ছায়ায় অবস্থান করবে। (আহমদ)

সাহাবীদের জীবনে সদকার আমল

একদিন হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খাইবর এলাকায় একখন্ড জমি পেলেন, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আমি 'খাইবরে' একখন্ড জমি পেয়েছি, এর চেয়ে উত্তম কোন সম্পদ আমি কখনো পাইনি। এ ব্যাপারে কী করা আমার জন্য উত্তম হবে? তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তোমার মালিকানা অক্ষুণ্ন রেখে একে সদকা করে দিতে পার। অতঃপর হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এটি দরিদ্র, নিকটত্মীয়, দাস-দাসী, দুর্বল ও অসহায় মুসাফিরদের কল্যাণে সদকা করলেন এবং শর্তারোপ করলেন যে, এটি কখনো বিক্রি করা যাবে না। এ মর্মে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী-

তখন আবু তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ 'বাইরোহা'। এটি আমি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য দান করে দিলাম।

আমি এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌ র নৈকট্য আশা করি। তারপর সরকারে দোজাহান সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'বাইরোহা' লাভজনক সম্পদ। এটি তোমার গরীব নিকটত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করে দাও। এরপর তিনি তাদের মাঝে বন্টন করে দিলেন।

দুনিয়ায় সম্পদের পাহাড় না গড়ে পরকালীন নাজাতের নিমিত্তে সাহাবাদের ন্যায় পার্থিব সম্পদকে সৎ পথে সদকা করার সদিচ্ছা মৃত্যুর পূর্বেই বাস্তবায়ন করা ঈমানদারী কাজ। কেননা মানুষের মৃত্যু এক মুহূর্তও বিলম্বিত হবে না। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে এসেছে -

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ"-وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ-

অর্থ ঃ তোমরা মৃত্যু আসার পূর্বেই আল্লাহ্‌ প্রদত্ত রিযিক থেকে ব্যয় কর, যখন তোমরা এই বলে আফসোস করবে এবং বলবে হে আমার প্রভু আমাকে যদি অল্প সময়ের অবকাশ দেয়া হতো তাহলে আমি সদকা করতাম এবং নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। কিন্তু কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে আল্লাহ্‌ তা কখনো এক মূহূর্তের জন্যও পিছিয়ে দেন না। তোমরা যে আমল কর আল্লাহ্‌ সে সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত আছেন। (সূরা মুনাফিকুন : ১০/১১)

ইসলামী সভ্যতার বিকাশ, দ্বীনি শিক্ষার প্রসার, দাওয়াতে খাইরের খেদমত জারি রাখার নিমিত্তে মসজিদ, মাদরাসা, এতিমখানা তৈরি, রাস্তাঘাট তৈরি বা মেরামত, দান-খায়রাত করা এবং ভারসাম্য পূর্ণ আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

সকলকে ঈদের শুভেচ্ছা

মাওলানা মোস্তাক আহমেদ

সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ যুবসেনা কেন্দ্রীয় কমিটি।

আলহামদুলিল্লাহ্‌, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। সকলকে ঈদের শুভেচ্ছা।

সারা রমজান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রোজা রাখার পর, ঈদ পালন করা হয়, আর ঈদ ধনী গরিব সকলের জন্য। নবী করিম (H) এরশাদ ফরমান, "তোমরা একে অন্যকে উপহার দাও এতে তোমাদের মধ্যে ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে" (মেশকাত শরীফ)।

আরেক হাদিসে এসেছে এক ব্যক্তি নবীজির নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ (H)! আমার অন্তর অনেক সক্ত কি ভাবে নরম করতে পারি? নবীজি এরশাদ ফরমালেন, "তুমি এতিমের মাথা হাত রাখ" (মেশকাত শরীফ)।

আমরা যখন নিজের ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোনদের জন্য ঈদের কেনাকাটা করি সাথে সাথে আমাদের আসে পাশে অনেক গরিব, অভাবি ও এতিম মানুষ থাকে যাদের এত অর্থ নাই তাদের সন্তানকে একটি ঈদের জামা কিনে দিবে। আমি আশা করি এবং বিশ্বাস করি আপনার একটি নেক নজরের কারনে তারা উপভোগ করতে পারে একটি ঈদ আনন্দন।

এভাবে আমরা একে অন্যের আনন্দকে ভাগ করে নিতে পারি। আর এইটাই হলো নবীজির সুন্নাত।

www.sunnibarta.com

প্রশ্নোত্তর (আক্বিদা ও আমল)

মুফতী মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দিন

প্রশ্ন :- আমাদের দেশের অনেক জায়গায় দেখা যায়- মাযারে ফুল দেয়া হয়- আবার নতুন কবরেও ফুল দিতে দেখা যায়। কিন্তু কেউ কেউ এ কাজটাকে শিরক-বিদআত ইত্যাদি ফতোয়া দিতেও লক্ষ্য করা যায়। তাই আমরা বিষয়টির সঠিক সমাধান কুরআন -হাদীসের আলোকে জানতে আগ্রহী।
মুহাম্মদ কামাল হোসেন
শাহারস্তি, চাঁদপুর।

উত্তর :- আউলিয়ায়ে কেরামের মাযারে ফুল ছিঁটানো মুস্তাহাব। এতে করে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও মুহাব্বত প্রদর্শন করা হয়। আউলিয়ায়ে কেরাম মহান আল্লাহ্ র নিদর্শন। তাদেরকে সম্মান ও তাজিম করা এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রদর্শনের কথা আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে ইঙ্গিত দিয়েছেন

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি আল্লাহ্'র নিদর্শনসমূহকে সম্মান করে- সেটা যেন তার অন্তরের তাকওয়া"।

অনুরূপ সাধারণ মুসলমানের কবরেও ফুল ছিটানো শরীয়তের আলোকে বৈধ এবং তা কবরবাসীর জন্য উপকারী। নিম্নে কয়েকটি দলীল উপস্থাপনা করা হল।

দলীল নং -১

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন -
تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

অর্থাৎ-তারই পবিত্রতা ঘোষণা করে সপ্ত আসমান ও যমীন এবং যা কিছু সেগুলোর মধ্যে রয়েছে। এবং কোন বস্তু নেই, যা তার প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা বর্ণনা করে না। তবে তোমরা সেগুলোর তাসবীহ অনুধাবন করতে পার না। নিশ্চয় তিনি সহনশীল ক্ষমা পরায়ন। (সূরা বণী ইসরাঈল আয়াত -৪৪)

অত্র আয়াতের আলোকে বলা যায়- মৃতব্যক্তির কবরের উপর যে সবুজ ঘাঁস কিংবা ফুল থাকে-তা আল্লাহ্'র তাসবীহ পাঠ করছে। এবং সেই তাসবীহ'র সওয়াব ঐ কবরবাসীর কাছে পৌছিয়ে দেয়া হয়। এতে করে কবরবাসী নেককার হলে তার মর্তবা বেড়ে যায়- আর গুনাহ্গার হলে উক্ত তাসবীহ-তাহলীলের বরকতে তার গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

দলীল নং- ২
عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، فقال: «إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» ثم أخذ جريدة رطبة، فشقها نصفين، فغرز في كل قبر واحدة، قالوا: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا»

অর্থাৎ- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একদা এমন দু'টি কবরের পার্শ্ব দিয়ে গমন করলেন- যাতে আযাব চলছিল। নবীজি বললেন, বাহ্যিক দৃষ্টিতে বড় বিষয়ে গুনাহ'র কারণে তাদের আযাব চলছে না; বরং তাদের একজনের অভ্যাস ছিল সে পেশাব থেকে নিজেকে রক্ষা করত না। অপরজন পরনিন্দা করে বেড়াত।

অতঃপর নবীজি একটি কাঁচা খেজুর ডাল নিলেন আর সেটাকে দু'ভাগ করে দু'কবরে গেঁড়ে দিলেন। সাহাবীগণ আরজ করলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ কাজটা কী জন্য করলেন? নবীজি জবাব দিলেন- এই জন্য যে, যতদিন ডাল দু'টি তরু-তাজা থাকবে, ততদিন তাদের আযাব হাল্কা হবে"। সূত্র : সহীহ বুখারী ১ম খন্ড ১৮২ পৃষ্ঠা।

বুঝা গেল, খেজুরের ডালার তাসবীহ-তাহলীল তথা জিকিরের বরকতে যদি কবরের আযাব হালকা হয় তাহলে ফুলতো আরো পবিত্র।

www.sunnibarta.com

দলীল নং - ৩

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রাঃ) ফতহুল বারী শরহে বুখারীতে লিখেন-

يسبح مادام رطبا فينحصل التخفيف ببركة التسبيح وعلى هذا فيطرد فى كل مافيه رطوبة من الاشجار وغيرها وكذالك فيه بركة كالذكر وتلاوة القران من باب الاول -

অর্থাৎ- গাছের ডাল-পালা, ফুল কিংবা ঘাস যতক্ষণ তাজা থাকবে ততক্ষণ সেগুলোর তাসবীহ পাঠের বরকতে কবরের আযাব হালকা করে দেয়া হবে। সুতরাং গাছ এবং গাছজাতীয় (উদ্ভীদ) যার মধ্যে সজীবতা রয়েছে - যেমন ফুল ইত্যাদি তা কবরের উপর ছিটানো যাবে। যেহেতু এসব আল্লাহ্‌র জিকির করে থাকে। সুতরাং কবরের উপর কুরআন তিলাওয়াত করা আরো বেশী বরকতপূর্ণ আমল।

দলীল নং -৪

ফতোয়ায়ে আলমগীরিতে রয়েছে -

وضع الورود والرياحين على القبور حسن. وان تصدق بقيمة الورد احسن -

অর্থাৎ- "গোলাপ কিংবা অন্য কোন ফুল কবরের উপর ছিটানো উত্তম কাজ এবং ঐ ফুলের দাম সদকা করে দেয়া আরো উত্তম"। আলমগীরি ৫ম খন্ড ৩৫১ পৃষ্ঠা কোয়েটা হতে প্রকাশিত।

দলীল নং- ৫

মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন -

وقد افتى الائمة من متاخرى اصحابنا من ان ما اعتيد من وضع الريحان والجريدة سنة لهذا الحديث واذا كان يرجى التخفيف بتسبيح الجريدة فبتلاوة القران اعظم بركة.

অর্থাৎ- "আমাদের হানাফী মাযহাবের মুতাআখরীন (পরবর্তী) ইমামগণ ফতোয়া পেশ করেন যে, কবরের উপর ফুল ছিটানো এবং গাছের ডাল-পালা লাগানোর যে প্রচলন আমরা দেখতে পাই, তা উল্লেখিত হাদীসের দ্বারা সুন্নাত প্রমাণিত। সুতরাং, বুঝা গেল- গাছের ডাল-পালার তাসবীহ পাঠের বরকতে যদি কবরের আযাব হালকা হওয়ার আশা করা যায়- তাহলে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের বরকত যে কত বেশী- তা বলাই বাহুল্য।

উপরোক্ত কুরআন-হাদীস ও ফিক্বহ ফতোয়ার প্রামাণ্য দলিলাদীর আলোকে স্পষ্টভাবে বুঝা গেল, আউলিয়ায়ে কেরামের মাযার সমূহে এবং ঈমানদার মুসলমানদের কবরে ফুল ছিটানো মুস্তাহাব এবং ফজিলতপূর্ণ আমল। যুগ-যুগ ধরে নিয়ম প্রচলিত হওয়ার পরও কেউ এর বিরোধীতা করলে তা নিঃসন্দেহে হাস্যকর। নাজায়েজের পক্ষে তারা একটা দলীলও দেখাতে পারবে না।

সুতরাং, কুরআন-হাদীস সমর্থিত এমন একটি উত্তম কাজকে শির্‌ক ফতোয়া দেওয়া অজ্ঞতারই পরিচায়ক। কারণ, আল্লাহ্‌'র কি কোন মাযার আছে, যেখানে ফুল ছিটানো হয়? নাউযুবিল্লাহ। তাহলে কেন শিরিক হবে? মজার ব্যাপার হলো-যারা মাযার ফুল দেয়া শির্‌ক ফতোয়া দেয়- তারাও অনেক সময় সাভার স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়েছেন। এতে করে তারা কি তাদের ফতোয়ার আলোকে মুশরিক হয়ে যান নি? নিজেরাই মুশরিক হয়ে বাকী মুসলমানদেরকে হেদায়ত করতে চায়? আসতাগফিরুল্লাহ।

১৩.প্রশ্ন :- মসজিদে মাইক দ্বারা আযান দেয়া, নামাজ পড়া, খুৎবা পাঠ করা এবং বৈদুত্যিক ফ্যান ব্যবহার করা যাবে কিনা?

উত্তর : মসজিদে মাইক ব্যবহার তথা মাইকে আজান দেয়া, খোৎবা পড়া, নামাজ মুনাজাত ইত্যাদি অবশ্যই জায়েজ বরং উল্লেখিত ইবাদত বন্দেগীর লক্ষ্য উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ক্ষেত্র বিশেষে মাইক এর বিকল্প নেই। মাইক বিজ্ঞানের অবদান। আর বিজ্ঞানের মূল উৎস পবিত্র কুরআন। সর্বোপরী আল্লাহ্‌র সৃষ্টি জগতের সবকিছু মানবকল্যাণে নিবেদিত। যেমন ইরশাদ হয়েছে-

خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

www.sunnibarta.com

অর্থাৎ, পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সবকিছু আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং আল্লাহ্ পাকের সৃষ্টি বস্তুকে আল্লাহ্র ইবাদতে ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে যুক্তিযুক্ত।

জন্যসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি সবক্ষেত্রে প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়। এক সময় যে সব মসজিদে চল্লিশ-পঞ্চাশ জন মুসল্লি নামাজ আদায় করত, সে সব মসজিদে বর্তমানে হাজার-হাজার মুসল্লির সমাবেশ নিত্য নৈমিত্তিক ও স্বাভাবিক ব্যাপার। বিশেষ করে শহরের মসজিদগুলো ৪/৫ তলা বিশিষ্ট করার পরও মুসল্লি সংকুলন হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে সকল মুসল্লির কানে খুৎবার আওয়াজ ঠিকমত না পৌঁছাতে হলে লাউড স্পীকারের বিকল্প নেই। অনুরূপ নামাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্যও মাইকের বিকল্প নেই। অন্যথায়, মুসল্লিরা পড়ে যাবেন কঠিন পরিস্থিতিতে। অথচ, মহান আল্লাহ্ কখনো চান না বান্দা কষ্টে নিপতিত হোক। যেমন, ইরশাদ হয়েছে-

يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের জন্য সহজ পন্থার কামনা করেন। কখনো কাঠিন্যতা তিনি তোমাদের জন্য পছন্দ করেন না।

পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ্র গবেষণার ফসল আধুনিক বিজ্ঞানের বধান্যতায় মানুষ যখন মহাশুন্যে পরিভ্রমন করে বেড়াচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে মসজিদে মাইক ব্যবহার করা যাবে কি না এই বিষয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করা রীতিমত হাস্যকরও বটে। বরং এ সব বিষয়ে প্রশ্নের অবতারনা করা বিশ্বের দরবারে ইসলামকে একটি সংকীর্ণ ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করার নামান্তর।

মসজিদে মাইক, বৈদ্যুতিক পাখা ইত্যাদি ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে বৈধ। নিম্নে ইসলামি আইন শাস্ত্রের কতিপয় নীতিমালা উপস্থাপন করার প্রয়াস পাচ্ছি।

১ম দলীল ঃ-

أَصْلَ الْأَشْيَاءِالاباحة

অর্থাৎ, প্রত্যেক বস্তুর মৌলিক অবস্থা "বৈধ"। আল আশবাহ ওয়ান নাজায়ের, হেদায়া ইত্যাদি।

কোন কাজ হারাম (নিষিদ্ধ) হবার ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ্র কোন দলীল পাওয়া গেলে তখন অবৈধ হবে। অন্যথায় সর্বাবস্থায় বৈধ। মসজিদে মাইক, বৈধ্যতিক পাখা ইত্যাদি ব্যবহার হারাম হওয়ার ব্যাপারে যেহেতু কোন দলীল নেই, সেহেতু তা জায়েজ হওয়াই ইসলামী আইনের বিধান। অধিকন্তু মাইক ব্যবহারের ফলে ইবাদত অনেকটা সহজতর হয়ে যায়। যেমন মাইক ব্যবহারের কারণে ইমাম সাহেবের কুরআন তিলাওয়াত মুসল্লিরা সবাই শুনতে পায়। এতে একদিকে কিরাত শ্রবণের সওয়াব অর্জিত হয়, অন্যদিকে মহান আল্লাহ্র নির্দেশের বাস্তবায়ন হয়। যেমন ইরশাদ হয়েছে-

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

অর্থাৎ, যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা মন দিয়ে শোন, আর নিশ্চুপ থাক, যেন তোমাদের উপর রহমত বর্ষিত হয়। (সূরা আ'রাফ : ২০৪)

তাফসীরকারকদের মতে উক্ত আয়াতে ইমামের কিরাত শ্রবণ করার জন্য মুসল্লিদেরকে বিশেষভাবে তাকিদ দেয়া হয়েছে। সুতরাং যে সব মসজিদে মাইক রয়েছে সেখানকার মুসল্লিরা উক্ত আয়াতের উপর আমল করা যতটুকু সহজ ও সম্ভব, মাইকছাড়া মসজিদে তা আদৌ সম্ভব নয়।

দলীল নং - ২

ماراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن الحديث

অর্থাৎ, অধিকাংশ মুসলমান যে বিষয়কে ভাল ও উত্তম মনে করে, তা মহান আল্লাহ্র নিকটও ভাল।

মাইক ও বৈদ্যুতিক পাখা আবিস্কার বেশী দিনের নয়। এগুলো নবীজির যুগে ছিল না। সাহাবী তাবেয়ীর যুগেও ছিল না। বরং, হাজারো বছর পরে আবিস্কার হয়েছে। আবিস্কারের পর পরই ইবাদতে মাইক ও বৈদ্যুতিক পাখা ব্যবহার করা নিয়ে বিতর্ক শুরু হলে বিশ্বের বড় বড় ওলামায়ে কেরাম গবেষণা করে বৈদ্যতার পক্ষে রায় দিয়েছেন। ফলে বর্তমান বিশ্বের মক্কা-মদীনা, মিসর, সুদান, ইরাক, ইরানসহ সব দেশে বড় বড় মসজিদে মাইকের প্রচলন রয়েছে। তবে মুকাব্বির যেহেতু সুন্নত, সেহেতু মাইকের পাশাপাশি একজন মুকাব্বির থাকলে

www.sunnibarta.com

আর বিতর্ক থাকে না মুকাব্বির যেহেতু সুন্নাত সেদিকটা লক্ষ করে মুকাব্বিরের কাছেও যদি একটি লাউড স্পিকার থাকে তা ভাল হয়।

দলীল নং -৩

الدين يسرو فى رواية يسروا ولاتعسروا الحديث

অর্থাৎ, দ্বীন হলো সহজ পন্থার নাম। অন্য হাদীসে রয়েছে, তোমরা সহজতা অবলম্বন করো; কঠিন পথ পরিহার করো (বুখারী ও মুসলিম ১ম খন্ড)

উল্লেখ্য যে, হাজার হাজার মুসল্লির জামায়াতে মাইক ব্যবহার না করলে নামাজের শৃংখলা রক্ষা অনেকটা দু:সাধ্য। বিশেষ করে দ্বিতল-ত্রিতল কিংবা বহুতল বিশিষ্ট মসজিদে মাইক ছাড়া ইমামের অনুসরণ কল্পনাই করা যায় না। সুতরাং এই কষ্ট দূরীকরণের জন্য মাইক ব্যবহারের বিকল্প নেই।

সম্মানিত পাঠক! বিষয়টি আরো পরিস্কার হয়ে গেল যে, আওয়াজ বড় করার জন্য নবীজি হযরত বেলাল (র:) কে একটি পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, কানে আঙ্গুল দিয়ে আজান দিলে আওয়াজ বড় হয়, তার চেয়ে শতগুন বড় হয় মাইক ব্যবহার করে।

আরো লক্ষ্য করুন, বিদায় হজ্বের ভাষন দেয়ার সময় রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাসওয়া নামক উষ্ট্রীর উপর আরোহন করেছিলেন। উদ্দেশ্যে ছিল আওয়াজ বড় করা। এখান থেকেও বুঝা যায় আওয়াজ বড় করার যত মাধ্যম থাকতে পারে তা অবলম্বন করা নবীজির সুন্নাত এবং সেই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে আজানের জন্য সুউচ্চ মিনার তৈরী করা হয়েছিল। বর্তমানে মাইক তার চেয়ে উন্নততর ও আধুনিক ব্যবস্থা। মসজিদে গম্বুজ-মিনার ইত্যাদি যদি জায়েজ হয় তাহলে মাইকও জায়েজ হবে নিঃসন্দেহে।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে বড় জামাতে মুকাব্বিরের যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল তার উদ্দেশ্যও ছিল আওয়াজ সকল মুসল্লিদের কানে পৌঁছানো যা বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞানের আবিস্কার লাউড (মাইক) দ্বারা সহজে সম্ভব হচ্ছে সুতরাং মাইক ব্যবহার ইবাদতের প্রতিবন্ধক নয়; বরং সহায়ক।

আর মসজিদে বৈদ্যুতিক পাখা ব্যবহারের ব্যাপারে আপত্তি তোলা নিছক অজ্ঞতা বৈকি। বৈদ্যুতিক পাখায় আগুনের স্পর্শ রয়েছে ঘোষনা করলে তার জন্য ভাত খাওয়াও জায়েজ হবে না। কারণ, ভাত রান্না হয় আগুন দ্বারা। কুরআন-হাদীস, তাফসীর ইত্যাদি মহামূল্যবান কিতাবসমূহ ছাঁপানো যাবেনা। কারণ, ছাঁপাখানা সম্পূর্ণটাই বিদ্যুত তথা আগুন দ্বারা পরিচালিত।

বিদ‘আত : একটি পর্যালোচনা

মুফতি মুহাম্মদ ওবাইদুল হক নঈমী*

‘বিদ‘আত’ মুসলমানদের নিকট একটি বহুল পরিচিত শব্দ। সিংহভাগ বিজ্ঞ উলামায়ে আহলে সুন্নাতের দৃষ্টিতে বিদ‘আত ভাল ও মন্দ এই দুই প্রকারে বিভক্ত। অর্থাৎ প্রত্যেক বিদ‘আত নিন্দনীয় নয়, আর যে কতিপয় আলেম বিদ‘আতকে মন্দ বলেছেন, তারাও বিদ‘আতের প্রকরণে বিশ্বাসী। অতএব, এ বিষয়ে প্রত্যেকেরই সুস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। আলোচ্য প্রবন্ধে এই বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

বিদ‘আতের পরিচয়

আভিধানিক অর্থ- আরবি بدعة (বিদ‘আতুন) শব্দটি فعلة (ফি‘লাতুন) শব্দের সমুচ্চারিত একটি বিশেষ্য পদ; যা মূল শব্দ بدع (বিদ‘উন) থেকে গৃহীত। যার শাব্দিক অর্থ নব আবিস্কার, নতুনত্ব, নতুন বস্তু, নতুন মত ইত্যাদি। ইমাম নাওয়াভী আলায়হির রাহমাহ্ বলেন,

البدعة كل شئى عمل على غير مثال سبق -

“পূর্বের কোন নমুনা ছাড়া যে কোন কৃত আমলকে বিদ‘আত বলা হয়।[১] উত্তম বিবেচিত এমন বস্তু সৌন্দর্যের দিক দিয়ে যার কোন উপমা নেই সে বস্তুর ক্ষেত্রেও আরবে বলা হয় هذا امر بديع ।[২] আবার এমন বস্তু বা বিষয় নতুনভাবে অস্তিত্বে এসেছে, তাকেই بدع বা بدعة বলা হয়, যেমন পবিত্র কুরআন মজীদে মহান আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

قل ما كنت بدعا من الرسل

অর্থাৎ আপনি বলুন, আমি কোনো নতুন রসূল নই।[৩] কারো কারো মতে, بدعة শব্দটি ابتداع থেকে গৃহীত ইসম বা বিশেষ্য পদ যার অর্থ ‘উদ্ভাবন’ করা। যেমন বলা হয়, (انشاه وبداه) ابدع الشئى يبدعه بدعا وابتدعه বিদ‘আত শব্দের অপর আভিধানিক অর্থ হলো ক্লান্ত হওয়া (الكلال) ও বিচ্ছিন্ন হওয়া (الانقطاع), যেমন কোন উট চলতে চলতে দুর্বলতার কারণে পথিমধ্যে বসে গেলে আরবে বলা হয়, ابدعت الراحلة ।[৪] البديع শব্দটি মহান আল্লাহ তা‘আলার অন্যতম গুণবাচক নাম, এর অর্থ নমুনা ছাড়া সৃষ্টিকারী বা অসাধারণ সৃষ্টিকারী। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন- بديع السموات والارض অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ) নমুনা ছাড়া আসমান সমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকারী।[৫] এককথায়, بدعت হলো পূর্ব নমুনা ব্যতীত যে কোন আমল বা পদ্ধতি, যার ক্ষেত্র ব্যাপক আর যা সুন্নাতের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়।

পারিভাষিক সংজ্ঞা

বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম বিদ‘আতের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন:

১. ইমাম নাওয়াভী আলায়হির রাহমাহ বলেন,

وفى الشرع احداث ما لم يكن فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

অর্থাৎ এমন নতুন কিছু সৃষ্টি করাকে বিদ‘আত বলা হয়, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা‘য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ছিল না।[৬]

২. মুফতি সৈয়্যদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মীর সৈয়্যদ শরীফ জুরজানী আ. এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,

هى الامر المحدث الذى لم يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعى

অর্থাৎ এমন নতুন উদ্ভাবিত বিষয়, যা সাহাবা ও তাবেয়ীনের যুগে ছিল না এবং যা শরয়ী দলিল দ্বারাও সমর্থিত নয়।[৭]

৩. আল্লামা শাতেবী বিদ‘আতের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, ان البدعه الحقيقية التى لم يدل عليها دليل شرعى لا من كتاب ولا من سنة ولا اجماع ولا استدلال معتبر عند اهل العلم لا فى الجملة ولا فى

[১]. মিরকাতুল মাফাতীহ, মোল্লা আলী ক্বারী-০১ খন্ড, পৃ. ২১৬।

[২]. আল বিদ‘আতুল হাসানাহ, শায়খ ঈসা আলহিময়ারী-পৃ. ২৪।

[৩]. আল্-কুরআনুল করিম, সূরা আহক্বাফ, আয়াত-৯।

[৪]. মুজামু মাক্বায়িছিল লুগাহ, ইবনু ফারেস, ১ম খন্ড, পৃ. ২০৯।

[৫]. আল্-কুরআন করীম, সূরা বাক্বারা, আয়াত-১১৭।

[৬]. মিরকাতুল মাফাতীহ, ০১, পৃ.২১৬।

[৭]. ক্বাওয়াইদুল ফিক্হ, পৃ. ২০৪।

www.sunnibarta.com

التفصيل অর্থাৎ মূলত বিদ'আত হলো তাই, যা শরীয়তের কোন দলিল দ্বারাই সমর্থিত নয়-না আল্লাহর কিতাব দ্বারা প্রমাণিত, না সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দ্বারা প্রমাণিত, না ইজমা দ্বারা, না এমন কোন দলিল দ্বারা প্রমাণিত, যা উলামায়ে কেরাম গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ থেকে অনুমান করেছেন। সংক্ষিপ্তভাবে হোক কিংবা বিস্তারিতভাবে।[৮]

৪. গায়রে মুকাল্লিদ বা লা-মাযহাবী আলেম মৌলভী ওয়াহিদুজ্জামান নবাব সিদ্দিক হাসান ভূপালীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, البدعة الضلالة المحرمة هى التى ترفع السنة مثلها والتى لاترفع شيئا منها فليست هى من البدعة بل هى مباح الاصل অর্থাৎ বিদ'আত হলো এমন নিষিদ্ধ নব আবিস্কৃত কাজ বা বিষয় যা কোন সুন্নাহকে নির্মূল করে। আর যা সুন্নাতের কোন রূপ বিলুপ্তি ঘটায় না তা বিদ'আত নয়; বরং মূলত তা বৈধ।[৯]

এই সংজ্ঞায় তিনি ওই বিদ'আতকে গোমরাহী বলেছেন, যা সুন্নাত পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আর যা সুন্নাত পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না, সে সকল উদ্ভাবিত নতুন পন্থা বিদ'আত নয়; বরং মূলত তা একটি বৈধ কাজ।

উল্লিখিত সংজ্ঞার পর্যালোচনা

প্রথম সংজ্ঞা পর্যালোচনা করলে আমরা জানতে পারি بدعت বলা হয় এমন নতুন বিষয়কে, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত হিসেবে প্রমাণিত হয়।

দ্বিতীয় সংজ্ঞায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর যুগ ছাড়াও সাহাবাও তাবেয়ীনের যুগকেও সংযোজন করা হয়েছে। আল্লামা আবদুল গণি নাবেলূসী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাবেয়ীনের পর তাব'ই তাবেয়ীনের কথাটিও বৃদ্ধি করেছেন। অর্থাৎ তাঁর মতে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও তাব'ই তাবেয়ীনের যুগের পর নতুন কিছু সৃষ্টি করাকে বিদ'আত বলা হয়। অতএব এই সংজ্ঞাগুলো থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, ইসলামের প্রাথমিক উত্তম তিন যুগের পর নতুন ভাবে সৃষ্টি বিষয়াদি এবং নতুন উদ্ভাবিত বিষয়, যা শরয়ী দলীল দ্বারা সমর্থিত নয়, এমন বিষয়কে বিদ'আত বলা হয়। উক্ত সংজ্ঞায় কোন বিষয় বিদ'আত হওয়ার জন্য দুইটি মূলনীতি ব্যক্ত করা হয়েছে।

ক. প্রাথমিক উত্তম তিনযুগে ওই বিষয় বা আমলের অস্তিত্ব না থাকা।

খ. 'দলীল-ই জাওয়ায' না থাকা অর্থাৎ সে বিষয় বা আমল বৈধ হওয়ার পক্ষে কোন দলীল না থাকা।

তৃতীয় সংজ্ঞা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আক্বীদা ও আমলের ক্ষেত্রে ওই সব উদ্ভাবিত বিষয়কে বিদ'আত বলা হয়, যার বৈধতার পক্ষে উসূলে আরবা'আহ্ (اصول اربعة) তথা ইসলামের চার মূল দলীলের কোন একটিতেও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

চতুর্থ সংজ্ঞায় প্রত্যেক বিদ'আতকে মন্দ বলা হয়নি; বরং ওই বিদ'আতকে মন্দ ও গোমরাহী বলা হয়েছে, যা অনুরূপ কোন সুন্নাতকে বিলুপ্ত করে দেয়। যেমন হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, انما المحذور بدعة نراغم سنة ما مورا بها অর্থাৎ ঐ বিদ'আতই মারাত্মক, যা কোন সুন্নাকে ধ্বংস করে দেয়।[১০]

সংজ্ঞাগুলোর মাঝে সমন্বয় সাধন ঃ

১ম ও ২য় সংজ্ঞার মাঝে বাহ্যত দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হলেও মূলত সংজ্ঞা দু'টির মাঝে কোন দ্বন্দ্ব নেই। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বলেছেন, فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشيدين المهديين অর্থাৎ তোমরা আমার সুন্নাত ও সঠিক দিশাপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধর।[১১] এ হাদিস শরীফ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলকে সুন্নাত হিসেবে অভিহিত করেছেন। আবার হুযুর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অন্যত্র বলেছেন, اوصيكم باصحابى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে আমার সাহাবা অতঃপর তাঁদের অনুগামী তাবেয়ীন অতঃপর তাঁদের অনুগামী তাব'ই তাবেয়ীনের ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছি। অর্থাৎ তোমরা তাদেরকে মেনে চলবে এবং তাদের

[৮]. দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,পৃ. ১০৯।

[৯]. হাদীয়াতুল মাহদী, পৃ. ১১৭।

[১০]. ইহয়াও উলমিদ্দীন, ২য় খন্ড, পৃ. ১৭২।

[১১]. জামেয়ুত তিরমিযী, ইমাম তিরমিযী (রহ.), হাদিস নং ২৬০০।

www.sunnibarta.com

অবাধ্য হবে না। সুতরাং সাহাবায়ে কেরামের আমল অথবা তাঁদের যুগে নতুন উদ্ভাবিত আমলকে প্রচলিত অর্থে 'সুন্নাতে সাহাবা' বলা হয়। আবার যেহেতু নতুন উদ্ভাবিত আমল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর যুগে ছিল না, সেহেতু সে আমলগুলো (بدعت حسنة) বা উত্তম বিদ'আত হিসেবে বিবেচিত হবে। কিন্তু সরাসরি মন্দ বিদ'আতের আওতায় পড়বে না। কেননা মন্দ বিদ'আত বা কতিপয়ের দৃষ্টিতে শরয়ী বিদ'আত হলো তাই যার সম্পর্কে دليل جواز বা বৈধতার দলীল নেই যা উল্লেখিত ২য় সংজ্ঞার শেষাংশ থেকে আমরা জানতে পেরেছি। আর এটা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, সাহাবায়ে কেরাম হলেন সত্যের মাপকাঠি। সুতরাং অনুরূপ হুকুম তাবেয়ীন ও তাব'ই তাবেয়ীনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। উল্লিখিত আলোচনা থেকে আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হলো যে, কোন ক্ষেত্রে কোন উদ্ভাবিত বিষয়ের সপক্ষে যদি কোন শরয়ী দলীল পাওয়া যায় সেটা 'বিদ'আতে হাসানাহ্' হিসেবে বিবেচিত হবে। ওই উদ্ভাবিত বিষয় যে কোন যুগেই হোক না কেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর যুগ পরবর্তী সময়ে উদ্ভাবিত নতুন বিষয়ের দৃষ্টান্ত হলো যেমন-হযরত আবদুর রহমান রদ্বি আল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, পবিত্র রমযান মাসে জামা'আতের সাথে নিয়মিত তারাবীহ্ নামায আদায় করতে দেখে হযরত ওমর ফারূক্বে আযম রদ্বি আল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, نعمت البدعة هذه অর্থাৎ এটি কতই উত্তম বিদ'আত।[১২] অন্যত্র তিনি বলেন, لئن كانت هذه البدعة لنعمت البدعة هى অর্থাৎ যদিও এটি বিদ'আত, তবুও তা উত্তম বিদ'আতই। এই বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, কিছু কিছু বিদ'আত রয়েছে যা মন্দ ও নিন্দনীয় নয় বরং প্রশংসনীয় ও উত্তম। অনুরূপ যখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রদ্বি আল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে যায়েদ ইবনে সাবিত রদ্বি আল্লাহু তা'আলা আনহুকে পবিত্র কুরআন মজীদ একত্রিত করার আদেশ দিলেন তখন তিনি (যায়েদ) এই বলে নিবেদন করলেন, كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم অর্থাৎ আপনারা কিভাবে এমন কাজ করতে যাচ্ছেন যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম করেননি।[১৩] উত্তরে তিনি বললেন, هو والله خير অর্থ: আল্লাহর শপথ! এতো ভাল কাজ।[১৪]

অর্থাৎ কাজটি বিদ'আত তো বটে, তবে উত্তম বিদ'আত। সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক উদ্ভাবিত ঐ সকল নতুন আমল বিদ'আতে হাসানাহ হিসেবে বিবেচিত যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর যুগে ছিল না। অনুরূপ যে কোন যুগে দলীল শরয়ী কর্তৃক সমর্থিত উদ্ভাবিত নতুন আমলও বিদ'আতে হাসানাহর আওতায় পড়বে।

অতএব, উল্লিখিত বিদ'আতের ৩য় ও ৪র্থ সংজ্ঞা এবং ১ম ও ২য় সংজ্ঞার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

বিদ'আতের প্রকরণ : পর্যালোচনা

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিদ'আত মূলত দুই প্রকার।

প্রথম প্রকার, بدعت حسنة বা উত্তম বিদ'আত। বিভিন্ন সংজ্ঞায় এরূপ বিদ'আতকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন بدعت صالحة (বিদ'আতে সালিহা), بدعت محمودة (বিদ'আতে মাহমুদাহ), بدعت هدى (বিদ'আতে হুদা), بدعت لغوية (বিদ'আতে লুগাভিয়াহ) ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রকার, بدعت سيئة (মন্দ বিদ'আত) অনুরূপ বিদ'আতকেও বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন بدعت ضلالة (বিদ'আতে দ্বোয়লালাহ), بدعت ضلال (বিদ'আতে দ্বোয়াল্লাহ), بدعت مذمومة (বিদ'আতে মাযমুমাহ) بدعت شرعية (বিদ'আতে শরঈয়াহ্) ইত্যাদি। সিংহভাগ উলামায়ে আহলে সুন্নাহ বিদ'আত হাসানাহ ও বিদ'আতে সায়্যিআহ্ এই দুই প্রকারে বিশ্বাসী। যেমন শায়খ ঈসা মানে' রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন,

وتقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة هو راى الجمهور وهو الصحيح অর্থাৎ বিদ'আতকে হাসানাহ (ভাল) ও সায়্যিআহ্ (মন্দ) দ্বারা বিভক্ত করাটা অধিকাংশ বিজ্ঞ উলামারই মত। আর এটাই বিশুদ্ধ।[১৫]

আবার তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিদ'আতকে ওয়াজিব, মুস্তাহাব, মুবাহ, মাকরূহ হারাম প্রকারাদিতেও বিভক্ত

[১২] . সহীহুল বুখারী, ইমাম বুখারী (রহ.) হাদিস নং ১৮৭১।

[১৩] . মিশকাতুল মাছাবীহ, শায়খ ওয়ালী উদ্দীন, পৃ. ১৯৩।

[১৪] . মিশকাতুল মাছাবীহ, প্রাগুক্ত।

[১৫] . ঈসা মানে হিমইয়ারী, আল বিদ'আতুল হাসানাহ, পৃ. ২৫৩।

www.sunnibarta.com

করেছেন। যেমন আল্লামা ইজ্জুদ্দীন ইব্নু আবদিস সালাম তাঁর রচিত كتاب القواعد গ্রন্থে বিদ'আতকে অনুরূপ পাঁচ প্রকারে বিভক্ত করেছেন।[১৬] মূলত এগুলো বিদ'আতে হাসানাহ্ ও বিদ'আতে সায়্যিআহর প্রকার। অর্থাৎ ১ম তিনটি বিদ'আতে হাসানার প্রকার আর শেষদু'টি বিদ'আতে সায়্যিআহর প্রকার। যারা বিদ'আত উত্তম ও মন্দ হওয়ায় বিশ্বাসী তাঁরা হলেন, হযরত ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, ইমাম ইজ্জুদ্দীন ইব্নু আবদিস সালাম রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, ইমাম হাফেয ইবনুল আরাবী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, ইমাম যারকানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, বদরুদ্দীন আইনী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, ইমাম ইবনে হাজর আসক্বালানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, ইমাম ক্বাসতালানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, ইমাম শিহাবুদ্দীন আবু শামা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, আল্লামা ইব্নুল আছির আল জাযরী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, ইমাম কিরমানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, ইমাম গাযালী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, আল্লামা ইব্নুল আবেদীন শামী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, প্রমূখ।

বর্তমানে যে সকল বাতিল ফেরকা এবং তথাকথিত স্বঘোষিত 'মুজতাহিদ' লেখকগণ জমহুর উলামার এই মতকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে এই দাবি করছে যে, বিদ'আতের মধ্যে ভাল ও মন্দ প্রকার বলতে কিছুই নেই। তাদের দৃষ্টিতে প্রতিটি বিদ'আতই ভ্রান্ত। তারা তাদের দাবির সপক্ষে কতিপয় আয়েম্মায়ে কেরামের উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন।

ইমামগন হলেন,

১. ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
২. ইমাম যারকাশী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি
৩. ইমাম শাতেবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

কিন্তু ইমাম শাতেবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহুমা প্রমূখ বিজ্ঞ আলেমদের রচিত গ্রন্থ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে অধ্যায়ন করলে আমরা জানতে পারি যে, তারাও বিদ'আতের প্রকরণ সমূহ অকপটে স্বীকার করেছেন। যেমন ইমাম ইব্নু রজব হাম্বলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "নিশ্চয় নিন্দনীয় বিদ'আত হলো তাই শরীয়তে যার সপক্ষে কোন উৎস নেই। শরীয়তের পরিভাষায় সেটিই বিদ'আত। অন্যদিকে প্রশংসনীয় বিদ'আত হলো তাই। যা সুন্নাহ কর্তৃক সমর্থিত অর্থাৎ সুন্নাহ তথা শরীয়তে যার সপক্ষে উৎস রয়েছে। নিঃসন্দেহে তা বিদ'আতে লুগাবী, শরয়ী নয়।[১৭]

ইমাম শাতেবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও অপরাপর আলেমগণও বিদ'আতকে অনুরূপ প্রকরণে বিভক্ত করেছেন। সুতরাং আমরা বলতে পারি প্রত্যেকেই বিদ'আতকে বিভক্ত করেছেন। আর সবাই এই বিষয়ে একমত। শুধু পার্থক্যের দিকটা হলো অনেকেই বিদ'আতে শরয়ীকে "হাসানাহ" ও "সায়্যিআহ" এই দুই প্রকারে বিভক্ত করেছেন অন্যদিকে কতিপয় আলেম লুগাভী ও শরয়ী এই দুই প্রকারে বিভক্ত করেছেন, কিন্তু একটু গভীর চিন্তা করলে দেখা যায় বিদ'আতে লুগাভীহ হলো বিদ'আতে হাসানাহ আর বিদ'আতে শরয়ীই হলো বিদ'আতে সায়্যিআহ।

বিদ'আতে হাসানারহ পক্ষে দালায়েল ঃ

বিদ'আতে হাসানাহ অগণিত দালায়েল দ্বারা প্রমানিত, নিম্নে কয়েকটি দালায়েল উপস্থাপিত হচ্ছে।

১. পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরআদ করেন,

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَاء رِضْوَانِ اللّهِ الخ

"আর তাঁর অনুসারীদের অন্তরে নম্রতা ও দয়া রেখেছি। আর বৈরাগী হওয়া এই বিষয়টি তো তারা ধর্মের মধ্যে নিজেদের নিকট থেকে আবিস্কার করেছেন। আমি তাদের উপর বিধিবদ্ধ করিনি, হ্যাঁ এ নব আবিস্কার তথা বিদ'আত তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য করেছিল।"[১৮] এই আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, ঈসায়ীগণ বিদ'আতে হাসানাহ অর্থাৎ বৈরাগ্য আবিস্কার করলো, আর আল্লাহ তা'আলা এটার প্রশংসা করলেন এবং পুরষ্কার দিলেন। *(চলবে)*

* লেখক, শায়খুল হাদিস, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।

[১৬] .মিরকাতুল মাফাতীহ, ০১খন্ড, পৃ. ২১৬।

[১৭]. ইবনে রজব, জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম, পৃ-২৫৩।

[১৮]. আল্-কুরআনুল করীম, সূরা হাদিদ, আয়াত-২৭।

www.sunnibarta.com